

অনুবাদ

(বাংলা দ্রুতপঠন)
অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ফাতেমা চৌধুরী
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মাল্লান
প্রফেসর জিয়াউল হাসান
নুরুন নাহার
মতিউর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৬

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অঙ্গনিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে সহপাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি জাতীয় অঞ্গগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমূল্যী ও যুগেযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা সহপাঠ্যপুস্তক ‘আনন্দপাঠ’ নামে সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও নানাসূত্রে যেন তাদের পরিচয় ঘটে, সে দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিশ্বসাহিত্য থেকে আটটি কাহিনি সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিরায়ত জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না সে দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষাগত সহজ সাবলীলতা ও গতিশীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১. কিশোর কাজি	(আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে)	১
২. রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে	মার্ক টোয়েন	৬
৩. রবিনসন ক্রুশো	ড্যানিয়েল ডিফো	২০
৪. সোহরাব রোস্তম	মূল : মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী বৃপ্তান্ত : মমতাজউদ্দীন আহমদ	২৯
৫. মার্চেন্ট অব ভেনিস	উইলিয়াম শেক্সপিয়ার	৪০
৬. রিপভ্যান উইংকল	ফখরুজ্জামান চৌধুরী (ওয়াশিংটন আরভিং রচিত গল্প অবলম্বনে)	৪৮
৭. সাড়ে তিন হাত জমি	মূল : লেভ তলস্তয় বৃপ্তান্ত : প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান	৫৬

কিশোর কাজি

(আৱব্য উপন্যাস অবলম্বনে)

খলিফা হারুন-অর-রশীদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত। সারা জীবন পরিশ্রম করে সে অনেক টাকা সঞ্চয় করেছিল। তারপর একবার কয়েকজন প্রতিবেশী মকায় হজ করতে যাবে শুনে তারও মকা যাবার খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু সংগঠিত অর্থগুলো কোথায় নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে সে নিয়ে



হলো সমস্যা। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলল, অর্থগুলো খলিফার নিকট রেখে যাও। আবার কেউ বলল, কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে রেখে গেলেই হয়। এসব শুনে অনেক চিন্তাভাবনা করে আলী একটি বড় কলসি কিনল। মকায় যাবার খরচ বাদে বাকি সমস্ত অর্থ কলসিতে রেখে সেটা জলপাই দিয়ে পূর্ণ করল। তারপর পাশের বাড়িতে বিশ্বস্ত বন্ধু নাজিমের নিকট গিয়ে কলসিটি আমানত রেখে এল এবং বলল, তুমি যদি আমার জলপাইয়ের কলসি রাখো খুবই উপকার হবে। আমি কিছুদিনের জন্য মকায় যাচ্ছি। নাজিম বলল, এ সামান্য বিষয় নিয়ে ভাববার কী আছে। তুমি কলসিটি এখানে রেখে নিশ্চিত মনে মকা শরিফ যেতে পারো। এই বলে খুশিমনেই বন্ধু নাজিম আলীকে নিশ্চিত করে বিদায় দিল। আলী অন্যদের সাথে মকায় রওনা হলো।

প্রায় দুবছর চলে গেছে এখনও আলী ফিরে আসেনি। একদিন নাজিমের স্ত্রী ও নাজিম খেতে বসেছে। প্রসঙ্গক্রমে তার স্ত্রী বলল, তার খুব জলপাই খেতে ইচ্ছে করছে। এখানে কোথাও জলপাই পাওয়া যাবে কি?

নাজিম বলল, কেন, আমাদের ঘরেই তো জলপাই আছে। সেই যে কন্ধু আলী এক কলসি জলপাই রেখে গেছে তা থেকে কয়েকটা নিলেই তো হয়।

স্ত্রী বাধা দিয়ে বলল, কী দরকার পরের আমানতের জিনিসে হাত দেওয়ার? তুমি বরং বাজার থেকেই কিনে আনো।

নাজিম বলল, দুবছর হলো আলী গেছে। এখনও তার কোনো খোজ পাওয়া যায়নি। জীবিত আছে কী না কে জানে? এগুলো খরচ করে নতুন জলপাই এনে না হয় কলসিটি তরে রাখলেই হবে।

একথা শুনে স্ত্রী আর অমত করল না। নাজিম তখন তাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করল এবং কলসির মুখ খুলে দেখল সবগুলো জলপাই পচে গেছে। নিচে ভালো থাকতে পারে তেবে সে কলসিটি উপুড় করে ঢেলে দিল।

কিন্তু এ কী! জলপাই কোথায়? এ যে রাশি রাশি সোনার মোহর!

নাজিম খুশিমনে সমস্ত মোহর ঢেলে তার সিদ্ধুকে তুলে রেখে দিল। তারপর বাজার থেকে এক ঝুড়ি টাটকা জলপাই কিনে নিয়ে কলসিতে ভরে রাখল।

কদিন পর আলী মঙ্কা থেকে ফিরে এল এবং কন্ধুর বাড়ি গেল। কন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার শেষে বন্ধুর নিকট থেকে কলসিটি চেয়ে বাড়ি নিয়ে চলে গেল। বাড়ি গিয়ে আলী দেখল কলসিতে একটি মোহরও নেই, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শুধু টাটকা জলপাইয়ে ভর্তি।

বিষণ্ণ মনে আলী আবার নাজিমের কাছে গিয়ে মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। নাজিম বিষয়ের ভান করে বলল, সে কী কন্ধু! তুমি আমার কাছে জলপাই রেখে গেলে। এখন মোহর চাচ্ছ, ব্যাপার কী?

আলী তখন বন্ধুর নিকট পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তাকে অনুরোধ করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বতু অনুনয় করা সত্ত্বেও মোহরগুলো ফিরিয়ে দিতে নাজিম রাজি হলো না। অগত্যা আলী কাজির দরবারে গিয়ে নালিশ জানাল। কাজির তলবে নাজিম বিচারালয়ে হাজির হলো।

কাজি প্রশ্ন করলেন, তুমি আলীর গচ্ছিত কলসিটি ফিরিয়ে দিলে, ওর ভিতরের মোহরগুলো দিচ্ছ না কেন?

নাজিম বলল, হুজুর ও আমার কাছে এক কলসি জলপাই গচ্ছিত রেখেছিল, তা তো পেয়েছেই। আমি তো কলসির মুখ খুলিনি, কী করে জানব ওতে কী ছিল।

কাজি বলল, আলী, তুমি যদি প্রমাণ দিতে পারো যে, তোমার কলসিতে জলপাইয়ের নিচে মোহর রেখেছিলে, তবে অবশ্যই তা পাবে।

কিন্তু আলী কীভাবে প্রমাণ করবে যে, তার কলসির ভিতর জলপাইয়ের নিচে মোহর রেখেছিল। তা তো আর কেউ জানে না। কাজেই হতাশ হয়ে ফিরতে হলো।

কিছুদিনের মধ্যে সারা বাগদাদে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন খলিফা হারুন-অর-রশীদ নিজ অভ্যাসমতো উজিরের সাথে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। জোছনার আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল। খলিফা ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন একস্থানে কতকগুলো বালক চাঁদের আলোয় বসে খেলা করছে। কৌতুহলী খলিফা সেখানে দাঁড়ালেন।

বালকের মধ্যে একজন বলল, তাই, চলো আজ আমরা আলী ও নাজিমের বিচার খেলি। তখন তাদের মধ্যে একজন আলী ও একজন নাজিম সাজল। একজন আলী সেজে একটি ভাঙা কলসিতে কতকগুলো মাটির ঢেলাপূর্ণ জলপাইয়ের কলসি তৈরি করল। বিচার আরম্ভ হলে আলী নালিশ করল। কাজি নাজিমকে হাজির করে জিজেস করল, আলী যা বলেছে তা কি সত্য? নাজিম বলল, হুজুর জলপাইয়ের কথা সত্য, তবে মোহরের কথা মিথ্যা। কাজি বলল, আচ্ছা কদিন আগে কলসিটি দিয়েছিল?

নাজিম বলল, তা প্রায় দুই বছর হবে।

কাজি বলল, বেশ, তখন কলসিতে কি এই জলপাই ছিল?

নাজিম বলল, হ্যাঁ হুজুর ছিল। কিন্তু আমি তা ছুইনি।

কাজি তখন একজন বালককে বলল, যাও তো একজন জলপাই ব্যবসায়ী ডেকে নিয়ে এসো। তখন একজন বালক জলপাই ব্যবসায়ী সেজে কাজির সামনে এসে দাঁড়াল। কাজি বলল, আচ্ছা জলপাই কত দিন পর্যন্ত ভালো থাকে বলো তো?

ব্যবসায়ী বলল, যত্নে রাখলে বড়জোর ছয় মাস টাটকা থাকে।

কাজি তখন সেই কলসিটি দেখিয়ে বলল, এই জলপাইগুলো দ্যাখো তো কত দিনের?

ব্যবসায়ী পরীক্ষার ভাল করে বলল, হুজুর, বেশি হলে এক মাস আগে এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে।

কাজি তখন নাজিমকে বলল, সব তো শুনলে। তুমি ভীষণ মিথ্যাবাদী। নিশ্চয়ই তুমি কলসির ভিতরের মোহরগুলো নিয়ে নতুন জলপাই দিয়ে কলসিটি ভর্তি করে রেখেছিলে। অতএব এখনই আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দাও। অন্যথায় তোমায় বন্দি করব।

নাজিম তখন সব স্বীকার করে আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল।

বালকের বিচারক্ষমতা দেখে খলিফা ও উজির বিশ্বিত হলেন এবং বালকদের অনেক পুরস্কার দিলেন।

খলিফা বালকদের বললেন, বালকেরা তোমরা আগামী দিন আমার বিচারালয়ে গিয়ে আলী ও নাজিমের বিচারটি করবে।

বালকেরা আনন্দিত মনে রাজি হলো।

পরদিন সকালে বালকদের বিচার দেখতে বিচারালয়ে অনেক মানুষের ভিড় হলো। খলিফা আলী ও নাজিমকে তাঁর দরবারে ডাকলেন এবং সেই বালকদেরও নিয়ে এলেন। যথানিয়মে সে বালক কাজির আসনে বসে বিচার করতে আরম্ভ করল। গত রাতের মতোই সে সঠিকভাবে বিচার করে নাজিমকে দোষী সাব্যস্ত করল।

তখন নাজিম বাধ্য হয়ে তার সকল অপরাধ স্বীকার করল এবং আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল। দরবারসুন্দ সব মানুষ তখন সেই বালকের প্রশংসা করতে লাগল।

খলিফা তখন খুশি হয়ে সেই বালকের শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন এবং বড় হলে তাকে কাজির পদ প্রদান করে পুরস্কৃত করলেন।

সার-সংক্ষেপ

কিশোর কাজি আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে রচিত একটি গল্প। এ গল্পে দেখানো হয়েছে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে কীভাবে বন্ধুও প্রতারণা করতে পারে। আর ছেটরা যে সব সময় অবহেলার পাত্র নয় তাও এই গল্পে ফুটে উঠেছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসন কালের কাহিনী। আলী কোজাই নামে বাগদাদে এক বণিক বাস করতেন। হজরত পালনের জন্য মক্কা যাওয়ার সময় তার সারা জীবনের স্বর্ণয় সোনার মোহর একটি কলসিতে ভরে জলপাই দিয়ে ঢেকে দিয়ে জলপাইয়ের কলসি বলে তার দীর্ঘদিনের বন্ধু নাজিমের কাছে রেখে যায়। একদিন তার স্ত্রী জলপাই থেতে আগ্রহ দেখালে নাজিম কলসি থেকে জলপাই নিতে গিয়ে দেখে এতে সোনার মোহর। এ সময় তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়। সে কলসির মোহর লুকিয়ে রেখে নতুন জলপাই দিয়ে তা ভরে রাখে। দীর্ঘদিন পর আলী কোজাই ফিরে এসে কলসি বাসায় নিয়ে দেখে এতে সোনার মোহর নেই। এ বিষয়ে নাজিমকে জানালে সে কিছুই জানে না বলে জানায়। কাজির দরবারে নালিশ করার পরও কোনো প্রতিকার পান না। কিন্তু একবারে খলিফা হৃদ্দয়েশে বেড়াতে গিয়ে দেখেন কিছু বালক নাজিম ও আলী কোজাই এর ঘটনার বিচার কাজের অভিনয় করছে। এই বিচার কাজ দেখে খলিফা বিস্মিত হলেন এবং ঐ কিশোর কাজির সহায়তায় নাজিমের বিচার করে আলী কোজাইকে তার সোনার মোহর ফেরত দিতে সক্ষম হলেন।

জীবন্যাপনের জটিলতায় প্রাণ্ডবয়স্করা অনেক সময় ভুলে যান যে জটিল সমস্যারও কখনো কখনো সহজ সমাধান থাকতে পারে। বড়দের চোখে যে সমস্যার সমাধান আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, একটি কিশোরের কাছে থাকে সে সমস্যারই সহজতম কোনো সমাধান। তাই কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ছেটদের মতামতকেও গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত।

শব্দার্থ

জলপাই	- এক জাতীয় ফল।
স্বর্ণয়	- জয়া।
মক্কা	- মুসলমানদের পবিত্র স্থান, এখানে কাবা শরিফ অবস্থিত।
বিশ্বস্ত	- যাকে বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।
সোনার মোহর	- সোনার টাকা (প্রাচীনকালে সোনার টাকার প্রচলন ছিল)
বিষণ্ণ	- দুঃখিত, বিবর্ণ।
গচ্ছিত	- দায়িত্ব নিয়ে রক্ষিত।
বিস্মিত	- অবাক, চমৎকৃত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “কিশোর কাজি” গল্লে আলী কোজাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে কী কিনেছিলেন?

ক. জলপাই	খ. কলসি
গ. সিন্দুক	ঘ. মোহর

২. খলিফা বালকদের খেলা থেকে কিসের কৌশল শিখেছিলেন?

ক. শান্তি প্রদানের	খ. বিচার করার
গ. সত্য উদঘাটনের	ঘ. হাসি খুশি থাকার

৩. আলী কোজাই এর বন্ধু নাজিম কেমন মানুষ ছিলেন?

ক. বন্ধুত্বে আস্থাশীল	খ. সঠিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন
গ. বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যন্ত	ঘ. অপরের ভাবনায় ব্যন্ত

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সজল বন্ধুদের সাথে স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি ব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। ব্যাগটি উঠিয়ে তাতে অনেক টাকা দেখতে পেয়ে তারা দুচিনায় পড়ে যায়। সজল টাকাগুলো প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শদেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আমের একজন লোক টাকাগুলো তার বলে দাবি করেন। কিন্তু কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সজল বুৰাতে পারে তিনি প্রকৃত মালিক নন। তখন তারা থানায় গিয়ে পুলিশের সহায়তায় প্রকৃত মালিক খুঁজে পায় ও ব্যাগটি হস্তান্তর করে। মালিক ব্যাগটি অক্ষত অবস্থায় পেয়ে খুশি হয়ে দোয়া করেন।

- ক. বালকেরা ভাঙা কলসিকে কী দিয়ে পূর্ণ করেছিল?
- খ. আলী কোজাই এর ঘটনা নিয়ে বিচারের নাটক হয়েছিল কেন?
- গ. উদ্বীপকের সজলের কাজটি ‘কিশোর কাজি’ গল্লের যে ঘটনাকে প্রতিফলিত করে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঘটনাগত মিল থাকলেও উদ্বীপকের ভাবের সাথে ‘কিশোর কাজি’ গল্লের ভাবের বেশ অলিল রয়েছে—
মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে

মার্ক টোয়েন

ষোড়শ শতাব্দীতে লন্ডনের এক বস্তির টম ক্যান্টি নামে একটি ছেলের জন্ম হলো। তার বাবামায়ের মুখে হাসি নেই। কারণ তারা খুব দরিদ্র। তাদের চিন্তা বাড়ল এই ভেবে যে, আরও একটা মুখে খাবার জোটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর ঠিক একই সময়ে একই দিনে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড টিউডরের ঘরে একটি ছেলের জন্ম হলো। এই ছেলের জন্মে রাজ্যময় খুশির চেউ বইল এবং নানা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হলো।

রাজকুমার বিজ্ঞ পাণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা নিতে লাগলেন আর বস্তির ছেলে টম বস্তির লোকের কাছ থেকে ভিক্ষা করার শিক্ষা নিল। তবে সে এক ধর্মবাজক ফাদার এন্ড্রুর কাছে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখছিল। বিশেষ করে ল্যাটিন শিখছিল। টম ছিল কল্জনাবিলাসী, সে সবসময় রাজা আর রাজকুমারদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। সে যতই রাজকীয় কল্জনাতে ডুবে থাকত ততই সবার উপহাসের পাত্র হতো। তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে সে রাজকুমার নামেই পরিচিত হতে চাইত। সেজন্য তাদের নিয়ে রাজকীয় সভার অনুসরণ করে নিজে রাজা হতো এবং অন্যদের উপাধি বর্ণন করত। ছেলেমেয়েরাও তার এই পাগলামি খেলা উপভোগ করত এবং আনন্দ পেত। সে মনে মনে ভাবত : আহা সত্যিকার রাজকুমারের যদি দেখা পেতাম!

একদিন সে ইঁটতে ইঁটতে অনেক দূরে এক অচেনা জায়গায় এসে গেল। সেখানে সে বিরাট বিরাট অট্টালিকা দেখল। এই অট্টালিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ওয়েস্টমিনস্টারস প্যালেসে সে এল। এসে মনে মনে ভাবল, এত বড় অট্টালিকা নিচয়ই কোনো রাজপ্রাসাদ হবে। এমন সময় গেটের ফাঁক দিয়ে সে তার বয়সী এক বালককে সুন্দর পোশাক পরা অবস্থায় দেখতে পেল। তখনই সে মনে মনে ভাবল, এ নিচয়ই সত্যিকারের রাজকুমার হবে। ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে তার ঘাড়ে এক পদাঘাত এল। বস্তুত এই পদাঘাতটি ছিল দারোয়ানের। সে বলল, এই ভিখারির বাচ্চা, সরে পড়। কোন সাহসে এখানে এসেছিস? অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গেটের ভিতরের রাজকুমারের নজরে সমস্ত ব্যাপারটা পড়ে গেল। রাজকুমার চিঢ়কার করে বলে উঠলেন দারোয়ান, আমার বাবার গরিব প্রজার সঙ্গে এমন জবন্য ব্যবহার করতে তুমি কী করে সাহস পেলে? এখনই দরজা খুলে এই বালককে আমার কাছে নিয়ে এসো।

ভিতরে ঢোকার পর রাজকুমার বললেন, তুমি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত এবং তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কথাটা যেন টমের বিশ্বাস হতে চায় না। সে বলল, ঠিক বলছেন তো স্যার, আপনার সঙ্গে আসব?

রাজকুমার অভয় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

টম রাজকুমারের সাথে ভিতরে গেল। দুজনে অনেক গল্প হলো। রাজকুমার টমকে রাজপ্রাসাদ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন। টমের কাছে সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। সে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে কি সবসময় এই সুন্দর পোশাক পরে থাকতে হয়?

নিশ্চয়ই।

আপনার জীবন কি সুখের!

আর রাজকুমার শুনল টমের বস্তি জীবনের কথা।

সে বলল, যেকোনো সময় নদীতে সাঁতার কাটা যায়, কাদা নিয়ে খেলা করা যায়, একে অন্যের দিকে কাদা ছুড়ে মেরে মজা করা যায়।

তখন রাজকুমার বললেন, তোমার জীবনও নিশ্চয়ই আনন্দ আর খুশিতে ভরা। আহা! আমি যদি তোমার পোশাক পরে কাদায় খেলা করতে পারতাম, তাহলে কী আনন্দটাই না পেতাম!

টম বলল, আর আমি যদি আপনার পোশাক পরতে পারতাম, তাহলে কী আনন্দই না পেতাম!

রাজকুমার বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমরা পোশাক বদল করতে পারি। তারপর তারা উভয়ে পোশাক বদল করে নিল।

তারা উভয়ে একে অপরের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল, কারণ তাদের চেহারা ও পোশাকে কে যে ভিখারির ছেলে আর কে যে রাজকুমার তা কেউ চিনে বের করতে পারবে না। কারণ তাদের দুজনের চেহারা



দেখতে হুবহু এক। শুধু পোশাক দ্বারা তাদের ভিন্ন করা যায়। টমের হাতের আঘাত পরীক্ষা করে রাজকুমার বললেন, উহ! তোমার নিশ্চয়ই খুব লেগেছিল? টম বলল, না, ও কিছু নয়। আমি এমনি আঘাত আর মার খেয়ে অভ্যস্ত। যে দারোয়ান টমকে মেরেছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভিক্ষুকের পোশাকে রাজকুমার বাড়ির গেটের দিকে গেলেন ও চিৎকার করে বললেন, দরজা খোলো। দারোয়ান তার কথামতো দরজা খুলে দিল।

রাজকুমার যেইমাত্র দরজার বাইরে বেরিয়েছেন অমনি দারোয়ান তাকে কষে এক চড় দিয়ে বলল, হে তিখারির ছেলে, আমাকে রাজকুমারের হাতে বকা খাওয়ানোর জন্য এটা তোর বখশিশ। তিখারির পোশাকে রাজকুমার মাটিতে পড়া অবস্থায় বললেন, বদমাইশ, আমি হচ্ছি রাজকুমার এডওয়ার্ড আর রাজকুমারের গায়ে হাত তোলা মস্ত অপরাধ। তখন দারোয়ান বলল, দূর হ তিখারি, এখান থেকে। এই সময় রাস্তার লোকজনও তাঁকে মারল।

তাদের হাত থেকে অনেক কষ্টে বের হয়ে রাজকুমার একা একা পথ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক সময় তিনি এক অচেনা পথে চলে এলেন। এখানে তিনি একটা ছোট ছেলেমেয়েদের হোস্টেল দেখলেন। তখন তাঁর মনে হলো যে, এই হোস্টেল নির্মাণ করেছেন তার বাবা। তাই তিনি সাহস করে হোস্টেলের ভিতর ঢুকে বললেন, হে কিশোররা, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তোমরা ভিতরে গিয়ে বসো ও অন্যদের বলো যে, রাজকুমার এডওয়ার্ড তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান।

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয়ই পাগল হবে। ঠিক আছে, আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই। দেখা যাক ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। তাই সবাই হাঁটু গেড়ে বসে রাজকুমারকে সম্মান দেখাল। তারপর সবাই তাঁকে চ্যাংদেলা করে ধরে নিয়ে সামনের পুকুরে ছুড়ে ফেলল। রাজকুমার আবার সবার হাতে অপমানিত হলেন।

পুকুর থেকে উঠে তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন। দিন শেষে রাত্রি ঘনিয়ে এল। তখন রাজকুমার ভাবলেন: আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। আমার একমাত্র উপায় হলো টমের বাড়ি খুঁজে বের করা। তাহলে তার পিতা-মাতা আমার প্রাসাদের দারোয়ানের কাছে গিয়ে বললেই হয়তো আমার এই বিপদ কেটে যাবে।

তারপর তিনি নিকটস্থ বস্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাতে একটা বলিষ্ঠ হাত তার হাত ধরল। তিনি চিন্কার করে উঠলেন, বাঁচাও বাঁচাও! সেই হাতের অধিকারী তখন বললেন, এই বদমাইশ, চিন্কার করছিস কেন? এতক্ষণ কেোথায় ছিলি? তোর হাড়গুলি সব পিটিয়ে ভাঙ্গ— না হলে আমার নাম জন ক্যাণ্টিই নয়। রাজকুমার তখন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইশ, কী সৌভাগ্য আমার! তাহলে তুমই তার বাবা? লোকটা বললেন, কী বলিসরে ছোকরা? আমি তার বাবা নই, আমি তোর বাবা। রাজকুমার বললেন, মহাশয় আমার সঙ্গে দয়া করে তামাশা করবেন না। আমি বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে আমার প্রাসাদের দারোয়ানকে যদি আপনি বলে দেন যে, আমি আপনার ছেলে নই, আমি রাজকুমার প্রিস অব ওয়েলস। এ—কথা শোনার পর লোকটা বললেন, প্রিস অব ওয়েলস, পাগল, তোকে বেত দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করতে হবে। তাহলেই তোর পাগলামি ছুটবে। তারপর টমের বাবা তাকে খুব মারতে লাগলেন। আর রাজকুমার চিন্কার করতে লাগলেন, আমাকে যেতে দাও, আমি তোমার ছেলে নই। আমি রাজকুমার প্রিস অব ওয়েলস।

হঠাতে ভিড়ের মধ্যে ফাদার এন্ডুকে দেখা গেল। তিনি এসে বললেন, থামো ছেলেকে মেরো না, সে অসুস্থ। সে তো তোমার কোনো ক্ষতি করছে না। জন ক্যাণ্টি তখন রাগের মাথায় ফাদারকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন ও রাজকুমারকে বাড়ির উপরতলায় পাঠিয়ে দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ির উপরতলায় এসে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোর নাম কী? রাজকুমার উত্তর দিলেন, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি যে আমার নাম এডওয়ার্ড প্রিস অব ওয়েলস। টমের মা তখন আফসোস করে বলে উঠলেন, টম তুমি যে বই নিয়ে পড়াশোনা

করেছ, তাতেই এটা হয়েছে। রাজকুমার বললেন, আমি আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য দুঃখিত। তবে আমি জীবনে আপনাকে আর কখনো দেখিনি। এ-কথা শুনেই টমের বাবা বেত দিয়ে রাজকুমারকে খুব মারলেন। রাজকুমার তার রাজকীয় কায়দায় যতই বড় বড় কথা বলেন তার বাবা ততই তাকে মারেন। অবশেষে টমের বাবা ক্লান্ত হয়ে রাজকুমারকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন।

ক্লান্ত রাজকুমার খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন। টমের মা লক্ষ করলেন যে টম তার হাত মাথার উপর রেখে ঘুমায়নি। মাথার উপর হাত রেখে ঘুমানোটা টমের অনেক দিনের অভ্যাস। তাই তিনি রাজকুমারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজকুমার তার হাত মাথায় নিয়ে গেলেন না। এমনিভাবে রাতে তিনি তিনবার এ-কাজটি করলেন। তবু তিনি স্থির করতে পারলেন না। টমের মায়ের মনে যে সন্দেহ হয়েছিল তা তিনি জোর করে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন, মাথায় গোলমাল হবার জন্য বোধ হয় তার পুরোনো অভ্যাসটা বদলে গেছে। এদিকে বেশ গভীর রাতে খবর এল যে ফাদার এন্ড্রুকে টমের বাবা যে আঘাত করেছিল তার ফলে তিনি মরতে বসেছেন। টমের বাবা তায় পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাত্মে পালানোর কথা স্থির করে ফেললেন। তিনি তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন— আমি আর টম এখনই চলে যাচ্ছি। তুমি এসে লন্ডন বিজের কাছে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর রাজকুমারকে নিয়ে জন ক্যাস্টি পথে বেরিয়ে দেখতে পেলেন এক বিরাট উৎসব মিছিল। পথে উৎসবরাত লোকেরা তাকে পান করার জন্য পানীয় দিল। জন ক্যাস্টি রাজকুমারকে ছেড়ে যেইমাত্র হাত উপরে তুললেন, এই সুযোগে রাজকুমার তিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। তারপর রাজকুমার খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে এই উৎসব হয়েছে। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন: টম ক্যাস্টি কি তাকে ফাঁকি দিল? কিন্তু মনে মনে তিনি বললেন: যেভাবেই হোক আমি তার সব পরিকল্পনা নস্যাং করব।

এদিকে রাজপ্রাসাদে টম ক্যাস্টির অবস্থাও বড়ই করুণ। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বলছে বাহু! আমাকে সত্যি একজন রাজকুমারের মতো দেখা যাচ্ছে। আহ! আমার বস্তির সবাই যদি আমাকে অন্তত একবার এই পোশাকে দেখতে পেত! কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল, সে ভীত হয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ করে দরজা খুলে একটা মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল— রাজকুমার আপনার কি কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে? কিন্তু রাজকুমাররূপী টম ক্যাস্টি তখন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, আমি হারিয়ে গেছি—আমি হারিয়ে গেছি। এরা এবার নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করবে। তারপর সে সেই মেয়েটির কাছেই হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, আমাকে দয়া করো, আমি রাজকুমার নই, আমি টম ক্যাস্টি। আমার ছেঁড়া কাপড়চোপড় আমাকে ফিরিয়ে দাও এবং আমায় বাড়ি যেতে দাও। কিন্তু মেয়েটি কোনো কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর এখান থেকে সেখানে এমনিভাবে প্রচার হয়ে গেল যে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছে। সে অপ্রকৃতিস্থ এবং রাজা নিজে একটা ফরমান জারি করে সবাইকে সাবধান করে দিলেন যে রাজকুমারের অসুখের কথা যেন রাজপ্রাসাদের বাইরে না যায়।

একদিন রাজকুমাররূপী টমকে রাজাৰ কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রাজাকে দেখে টম বলে উঠল, আপনিই হলেন এখনকার রাজা? এই কথা শুনে রাজা বললেন, আমি যে গুজব শুনেছিলাম তা দেখছি সত্যি। রাজা আদর করে তাকে ডাকলেন। কিন্তু টম বলে উঠল, মহাশয়, আপনি আমার বাবা নন এবং আমিও রাজকুমার নই। আমি আপনার অধীন একজন গরিব প্রজা। কোনো এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে আমি এখানে এসে পড়েছি। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। আমাকে হত্যা করবেন না।

রাজা ভাবলেন, বোধ হয় সে তার নিজের পরিচয় ভুলে গেছে। তাই পরীক্ষা করার জন্য ল্যাটিন ভাষায় প্রশ্ন করলেন। টম ঠিক ঠিক উত্তরই দিল। তখন রাজা মনে মনে ভাবলেন যে বেশি পড়াশোনা করার জন্য তার এই অবস্থা হয়েছে। তাকে খেলাধূলায় ব্যস্ত রাখতে হবে। সে হলো আমার একমাত্র উন্নতরাধিকারী। আর কালই তার অভিযোগ করতে হবে। রাজা যাকে কথাগুলো বলছিলেন তিনি বলে উঠলেন, তুজুর আপনি কি ভুলে গেছেন নরফোকের ডিউক এখনও আপনার রাজনৈতিক বন্দি, তাকে সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। রাজা বললেন, সে আদেশ ঠিক থাকবে। ঠিক আছে তুজুর, বলে লোকটা বিদায় নিল।

সেদিন রাজকুমারের ঘরে বসে টম একা একা বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের উপর। সে বলল, উঃ! এটা অসহ্য, রাজার আদেশে ঐ লোকটাকে হত্যা করা হবে। আহা! এই সময় যদি সত্যিকারের রাজকুমার ফিরে আসতেন।

সেদিন বিকেলে লর্ড হাটফোর্ড রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তুমি যেই হও, তুমি যে রাজকুমার নও এ-কথা অঙ্গীকার করবে না। টমও ভাবল, ঠিক আছে তারা যেভাবে বলে সেভাবে চলে দেখি। এরপর থেকে টম রাজকুমারের যাবতীয় কাজ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে পদে পদে ভুল করতে লাগল। যেমন ভালো তোয়ালে নষ্ট হবে মনে করে হাত মুছতে ভয় পেতে লাগল। গোলাপজল দেওয়া হাত ধোয়ার পানি সে পান করে ফেলল। ফলমূল, বাদাম সব পকেটে পুরে ফেলতে লাগল। সেদিন বিকেলে অসুস্থ রাজার অবস্থার আরও অবনতি হলো।

রাজার সঙ্গে রাজার পরামর্শদাতা লর্ড চ্যাপেলের দেখা করলেন। রাজা বললেন, আমি শীঘ্রই মারা যাব। ডিউক অব নরফোকের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতে হবে। তাই একটা মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে নিয়ে এসো, আমি তাতে আমার সিল দিয়ে দিই। রাজা বিছানায় উঠে বসতে চাইলেন কিন্তু দুর্বলতার জন্য পারলেন না। এদিকে বড় সিলটা অনেক খোঁজার পরও পাওয়া গেল না। রাজা মনে মনে বললেন, আমি রাজকুমারের কাছে সিলটা রেখেছিলাম। রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে বলল যে, সে সিলটা কোথায় রেখেছে তা মনে করতে পারছে না। আপাতত ছোট সিল দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। রাজকুমারকে আনন্দিত রাখার জন্য তাকে নৌবিহারে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু এতসব আনন্দের মধ্যে থেকেও সে সুস্থি হতে পারছিল না।

এদিকে সত্যিকারের রাজকুমার রাস্তায় রাস্তায় লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন। রাজকুমারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একজন জোয়ান এগিয়ে এসে সবাইকে বাধা দিলেন। ফলে সৈনিকের সঙ্গে বিদ্যুপকারীদের তর্ক শুরু হলো। আর ঠিক এই সময় রাজার ঘোড়সওয়ারেরা সেই রাস্তায় তাদের মাঝখানে এসে পড়ল এবং সৈনিক ও রাজকুমার সবার থেকে আলাদা হয়ে পালিয়ে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পর রাস্তায় রাস্তায় এক ফরমান পাঠ করা হলো। এতে সবাইকে বলা হলো যে, রাজা মারা গিয়েছেন এবং রাজকুমার এডওয়ার্ড নতুন রাজা হয়েছেন। টম তার উপদেষ্টা লর্ড হাটফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি এখন থেকে রাজা হয়ে থাকি তাহলে আমার আদেশ বহাল থাকবে? লর্ড হাটফোর্ড বললেন, নিশ্চয়ই আপনার হুকুমই আইন। টম ক্যাণ্টি তখন বলল : আমার রাজত্ব হবে দয়ার, ক্ষমার। কোনো রক্তপাত হবে না আমার রাজত্বে এবং নৌরফোকের ডিউকের মৃত্যুদণ্ড আমি তুলে নিয়ে তাকে মুক্ত করগাম।

অন্যদিকে রাজকুমার যখন তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে রাস্তায় ইঁটছিলেন তখন রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার বাবা মারা গিয়েছেন। নতুন সৈনিকটি বলল, ওহো আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি রাজকুমার এডওয়ার্ড, এ দেশের নতুন রাজা। সৈনিক মনে মনে ভাবছিল : আহা বেচারা, তার মাথাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সব অবস্থাতে এই ছেলেটিকে আপনে-বিপন্দে রক্ষা করে যাব।

এরপর সৈনিকটি রাজকুমারকে একটা সরাইখানাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যেইমাত্র তারা সেখানে ঢুকতে যাবেন তখনই টমের বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এবার তুই পালিয়ে যেতে পারবি না বাচাধান, তোকে আচ্ছা করে পিটুনি দেব। সৈনিক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি তোমার কী হয়? লোকটি উন্নত দিলেন, এই বজ্জাত ছেলেটি আমার ছেলে। রাজকুমার বলে উঠলেন, মিথ্যা কথা, আমাকে যেন এই লোকটার জিম্মায় ছেড়ে দিও না। সৈনিক বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমার সাথেই থাকবে। জন ক্যান্টি তখন গজরাতে গজরাতে বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে। সৈনিক তখন তার খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললেন, সাবধান একে ছুঁয়েছ কি তোমার একদিন কি আমার একদিন। এই ছেলে আমার তদ্বাবধানে থাকবে। তুমি কি মনে করো তোমার মতো একজন জঘন্য ব্যক্তির হাতে একে ছেড়ে দেব? যাও এখান থেকে সরে পড়ো, আর এ ব্যাপারে চৃপচাপ থাকতেই চেষ্টা করো।

সৈনিক রাজকুমারকে বললেন, আমি থাকতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না বা কেউ জ্বালাতনও করতে পারবে না। রাজকুমার বললেন, সৈনিক, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি যখন আমার সিংহাসনে আরোহণ করব তখন তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তারপরে সরাইখানাতে গিয়ে রাজকুমার ঘুমালেন আর সৈনিক তার জন্য একটা পোশাকের ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেলেন।

তোরে সৈনিক নিজ হাতে একটা পোশাক কিনে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন রাজকুমার বিছানায় নেই। তখন তিনি দৌড়ে সরাইখানাওয়ালার কাছে গিয়ে হুমকি দিলেন। তখন সরাইখানাওয়ালা বললেন, ও তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। আপনার সংবাদবাহক এসে খবর দিয়েছে যে আপনি তাকে লঙ্ঘন ব্রিজের ওখানে দেখা করতে বলেছেন।

সংবাদবাহক কি একা ছিল?

ইং, কিন্তু সে যখন ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল, তখন আরও একজন বদমাইশ প্রকৃতির লোক তাকে অনুসরণ করছিল।

একথা শুনে সৈনিক ছুটলেন রাজকুমারের খোঁজে।

এদিকে নকল রাজকুমার টম বিচার ও অন্যান্য রাজকার্য সমাধা করে যাচ্ছে। আর সত্যিকার রাজকুমার লঙ্ঘন ব্রিজের দিকে তার রাজপ্রাসাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় সেদিকে চলেছেন। হঠাৎ রাজকুমারের কানে এল, তোমার রক্ষক বন্ধু তোমাকে আজ রক্ষা করার জন্য আসছে না। রাজকুমার বললেন, এটা কোন ধরনের ধূর্ততা! তখন জন ক্যান্টি চাবুক হাতে এগিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয়ই তুই তোর বাবাকে চিনতে ভুল করিস নি। এখন এই গুদামঘরের ভিতর ঢোক এবং যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য ভিক্ষা করতে রাজি না হবি এখানেই তোকে কাটাতে হবে। এদিকে সেই সৈনিক পইপই করে রাজকুমারকে ঝুঁজছেন। পরে তিনি অনুমান

করলেন যে সেই বদমাইশ লোকটা যে তাকে ছেলেটির বাবা বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছিল, নিশ্চয়ই সে তাকে কোথাও আটকে রেখেছে। ভীত ও সন্তুষ্ট রাজকুমার পুরাতন গুদামের মধ্যে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

হঠাতে যখন তার ঘূম ভাঙ্গল তখন তিনি দেখলেন যে কয়েকজন চোরের এক সভা বসেছে। তারা সবাই চুরির জন্য নতুন নতুন উপায় উঙ্গাবনে ব্যস্ত। রাজকুমারের দিকে চোখ পড়তেই তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে তার মাথায় এক হেঁড়া টুপি পরিয়ে দলের নেতা বললেন, আমি তোমাকে ফুফু দি ফাস্ট নামে নামকরণ করলাম। পরের দিন তোরে রাজকুমার ও তার সঙ্গী ছেলেটি ভিক্ষা করতে বের হলেন। রাজকুমারকে ছেলেটি বলল, তুমি আমাকে হাগ্স বলে ডাকতে পারো। রাজকুমার বললেন, কিন্তু আমি তোমার মতো ভিক্ষা করতে পারব না। হাগ্স বলল, তুমি এত সাধু হলে কবে থেকে? তোমার বাবা যে বলল, তুমি গত জীবনে লভনে ভিক্ষা করে কাটিয়েছ? রাজকুমার বললেন, ওই বদমাইশটা আমার বাবা নয়। এমন সময় হাগ্স বলল, শীত্র এদিকে এসো। একজন ধনী লোক এদিকে আসছে। তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে না। তুমি শুধু তান করে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর আমি মাটির উপর শুয়ে অঙ্গান হবার তান করব। যখন ধনী লোকটি তোমার সামনের দিকে আসবে তখন হইচই করে চিন্কার করে বলবে যে আমি তোমার ভাই এবং আমরা কয়েক দিন কিছুই খাইনি। তারপর ছেলেটি রাজকুমারকে শাসিয়ে বলল, ঠিকমতো যদি কথা না শোনো তাহলে তোমার শরীরের হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করব।

ধনী ভদ্রলোকটি হাগ্সের কাছে এসে তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে? তখন সে বলল, আমি এক গরিব ছেলে, অনাহাবে তুগছি, আমাকে দয়া করে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন। লোকটি বললেন, আহা গরিব বেচারা, তোমায় একটা কেন তিনটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করব। ছেলেটি বলল, জনাব দয়া করে যদি আমাকে একটু ধরে ধরে আমার বাড়ি পৌঁছে দেন। এমনি সময় রাজকুমার চিন্কার করে উঠলেন, ও আমার ভাই নয়, সে একজন ভিক্ষুক ও চোর, আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, সে আপনার পকেট কেটেছে। আপনার লাঠির এক বাড়িতে ওর সব তান পালাবে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাগ্স দৌড়ে পালাল।

রাজকুমার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি তাবলেন এখন যদি আমি না পালিয়ে যাই তাহলে হাগ্স ভিক্ষুকদের নিয়ে এসে আমায় তাড়া করবে। তিনি সমস্তটা দিন কৃষকদের জমির চারদিক দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যার দিকে এক বনের ধারে এসে হাজির হলেন। এখানে দূরে একটা কুটিরে আলো ঝলতে দেখে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। এই কুটিরটা ছিল একজন খৃষ্টুল্য সন্ন্যাসীর। রাজকুমার ভিতরে গিয়ে পরিচয় দিলেন যে, সে ইংল্যান্ডের রাজা। কুটিরের ভিতরের সন্ন্যাসী বললেন, এসো ভিতরে এসো। আমার এখানে কাউকে জায়গা দিই না, তবে রাজার জন্য নিশ্চয়ই আমার জায়গা আছে। রাজকুমারকে সম্মোধন করে সন্ন্যাসী বললেন, আমার তোমাকে বিচার করার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি তোমাকে একটি গোপন তথ্য বলব, আমি সন্ন্যাসী নই। আমি হলাম একজন ফেরেস্তা। তুমি তাহলে হেনরির ছেলে, সে কি বেঁচে আছে? রাজকুমার বললেন, না কিছুক্ষণ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সন্ন্যাসী তাকে থাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ঘুমোতে দিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী এসে তাকে বলতে লাগলেন, তুমি তো জানো না তোমার বাবা আমার উপর অত্যাচার করেছেন। আমাকে ধর্ম থেকে বিতাড়িত করেছেন। আমাকে ও আমার অনুসারীদের দেশ থেকে তাড়িয়েছেন। এই জঙ্গলে আমি পালিয়ে আছি। যখন বুবলতে পারল যে রাজকুমার ঘুমিয়ে তখন তিনি বললেন, যতক্ষণ বেঁচে আছ সুখসন্ধি দেখে নাও। এই বলে তিনি বড় পাথরে ছুরি শান দিতে দিতে বলতে লাগলেন, তোমার বাবা আমার হাত থেকে বেঁচে গেছে, তুমি বাঁচবে না। তারপর তিনি তার হাত-পা ও মুখ দড়ি ও কাপড় দিয়ে বাঁধলেন। তারপর সন্ন্যাসী যেইমাত্র ছুরি উঁচিয়ে রাজকুমারকে হত্যা করতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কে যেন কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, বাসায় কে আছে? রাজকুমার সেই স্বর শুনে ভাবলেন, এ তো সেই সৈনিক কম্বুর গলা। সন্ন্যাসী দরজা খুলে দিতেই সৈনিক জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কোথায়? সন্ন্যাসী বললেন, কোন ছেলে? তখন সৈনিক রেগে গিয়ে বললেন, যে ছেলেটা ছুরি করেছিল তাকে আমি শাস্তি দিয়েছি। এখন তোমার এখানে যে এসেছে সে ছেলেটি কোথায়?

সন্ন্যাসী প্রথমে নানা কথা বলে তাকে ফাঁকি দিতে চাইলেন। কিন্তু সৈনিকের চাপের মুখে সন্ন্যাসী রাজকুমারকে সৈনিকের হাতে তুলে দিলেন। সৈনিক তখন সেই কেনা পোশাক রাজকুমারকে পরিয়ে গ্রাম থেকে দুটি গাঢ়া কিনে এনে তাতে চড়ে শহরের দিকে রওনা হলেন।

শহরে হেনডেন হলে এসে তারা পৌঁছলেন। এই হেনডেন হলটা ছিল সৈনিকের বাড়ি। সৈনিক বাড়ির কড়া নাড়তেই তার ভাই বেরিয়ে এলেন। সৈনিক তখন বললেন, আরে আমার ভাই! উহ! প্রায় সাত বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। কিন্তু তার ভাই তাকে না চেনার ভান করে বললেন, আপনি কে? সৈনিক বলল, আমি তোমার ভাই মাইল্স হেনডেন। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? তখন তার ভাই বললেন, আমার ভাই! তিনি তো কবে প্রায় তিন বছর হলো যুদ্ধে মারা গেছেন। তুমি একজন জালিয়াত। সৈনিক বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ঠিক আছে, তোমার বাবাকে ডাকো। বাবা মারা গেছেন। উহ! বড় দুঃখের সংবাদ, তাহলে লেডি এডিথকে ডাকো। কিছুক্ষণ পরে সৈনিকের ভাই এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো এই লোকটাকে তুমি চেনো কি না? লেডি এডিথ বললেন, এ লোকটাকে জীবনে আমি কখনো দেখিনি। সৈনিক রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, বদমাইশ, মিথুক, তুমি নিজে চিঠি লিখে জানিয়েছ যে আমি মরে গেছি এবং তারপর আমার বাগদত্তাকে বিয়ে করেছ। আমার সামনে থেকে দূর হও, নচেৎ তোমায় আমি হত্যা করব। এই বলে সৈনিক তার ভাইকে আক্রমণ করলেন।

আক্রান্ত ভাইয়ের চিৎকারে সব চাকর এসে হাজির। তখন সৈনিকের ভাই হিউগ বললেন, সব দরজা বন্ধ করে দাও যেন এই জালিয়াত পালাতে না পারে। সৈনিক বললেন, আমি পালাচ্ছি না, যে পর্যন্ত আমি ন্যায়মতো হেনডেন হলের উন্নরাধিকারী হচ্ছি। রাজকুমার বললেন, সত্যি বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। সৈনিক বললেন, হিউগ ছোটবেলা থেকেই বদমাইশ আর জোচোর স্ফতাবের ছিল। রাজকুমার বললেন, আমি ভাবছি যে আমাকে খোঁজার জন্য এখনও কোনো সৈন্য পাঠানো হলো না কেন? সৈনিক মনে মনে বললেন, আহা! বেচারার রাজকীয় দুঃসন্ধি এখনও যাইনি। রাজকুমার বললেন, আমি আমার সমস্ত ঘটনা এ কারণে লিখে রেখেছি। এটা তুমি আগামীকাল আমার চাচা লর্ড হাটফোর্ডের কাছে পৌঁছে দেবে। সৈনিক বললেন, ঠিক আছে।

ঠিক এমনই সময় একটা নারীকষ্ট হেসে এল : দয়া করে একটু থামুন স্যার। সৈনিক বললেন, বাগদত্তা বধু এডিথ, তুমি এখনও আমাকে না-চেনার ভান করছ? এডিথ বললেন, আমি দৃঢ়খিত স্যার, না, আমি না-চেনার ভান করছি না। আমি আপনার জন্য সমবেদনা অনুভব করছি। কারণ আপনি মাইল্সের মতো দেখতে। আপনি আমার স্বামীকে বিরক্ত করলে সে আপনাকে হত্যা করবে। সৈনিক বললেন, না একথা সত্যি নয়। তুমি সমবেদনা জানাতে আসনি, তুমি আমায় ভালোবাস তাই এসেছ।

ঠিক এমনি সময় পুলিশ এসে দরজা খুলে সৈনিক ও রাজকুমারকে জেলখানায় নিয়ে গেল। জেলখানায় তাদের কয়েক দিন কাটল। তারপর একদিন একজন পুরোনো চাকর এসে সৈনিকের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করল। সে বলল, হুঝুর আমি মনে করেছি আপনি মারা গেছেন। আপনাকে আবার জীবিত দেখলাম, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। সৈনিক বললেন, এন্ডু, আমি জানতাম তুমি আমার বিরুদ্ধে যাবে না।

প্রতিদিনই এন্ডু সৈনিকের সঙ্গে দেখা করে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে যেতে লাগল। এন্ডু বলল, এডিথ হিউগকে বিয়ে করেছে কিন্তু সে মোটেও সুখী নয়। সে এখনও আপনাকে ভালোবাসে। আপনার ভাই হিউগ আমাদের শাসিয়েছে। আমরা কেউ যদি আপনাকে চিনি বলে পরিচয় দিই তাহলে সে আমাদের হত্যা করবে। এখন রাজার অভিষেক হবার পরে নতুন রাজার অনুগ্রহে সে অনেক কিছু করবে বলে আশা করছে।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন অভিষেক উৎসব কবে? সৈনিক মাইল্সকে বললেন, তারা আর কাউকে সিংহাসনে বসাচ্ছে। আমাদের ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় যেতে হবে এবং যে করেই হোক এই অভিষেক উৎসব বন্ধ করতে হবে। সৈনিক বললেন, কালই আমার বিচার হবে, ঠিক সময়মতোই সেখানে পৌছাতে পারব।

পরের দিন বিচারে মাইল্সের দুদিনের জেল হবার আদেশ শোনার সঙ্গে রাজকুমার বললেন, হে জেজ, আপনি কেমন করে এর প্রতি অবিচার করতে পারেন? আমি আপনাকে হুকুম দিছি একে মৃত্তি দিন। বিচারক সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, এই বোকা ছেলেটাকে কয়েক ঘা বেত লাগাও। তাহলে তার জিহ্বা সংহ্যত হবে। সৈনিক নিজে বিচারকের কাছে মিনতি করলেন যে বালকটি বড় দুর্বল। বালকের ভাগের চাবুক আমাকে মারার অনুমতি দিন।

উন্নত প্রস্তাব, এই বেকুবকে এক ডজন চাবুক কর্যে লাগাও। চাবুক খাওয়া শেষে জেলখানার ভিতরে রাজকুমার সৈনিককে বললেন, তুমি সব লোক থেকে মহান এবং তোমাকে আজ থেকে আরল থেতাবে ভূমিত করলাম।

দুদিন পরে তারা দুঃজনেই কারামুক্ত হয়ে লভনের পথে রাজার অভিষেক দেখার জন্য রওনা হলেন। সৈনিক ভাবছিলেন এ যাত্রায় দুটো কাজ হবে। এক : রাজকুমারের ইচ্ছা পূরণ হবে, আর দুই : আমার বাবার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে আমার দেখা হয়ে যাবে। তারা লভনে ঢোকার পরে দেখলেন সবাই উৎসবে মেতে আছে। হঠাত একজন বলে উঠল, তুমি ধাক্কা দিয়ে আমার হাতের পেয়ালা ফেলে দিলে কেন? অন্যজন উত্তর দিল, সে ইচ্ছা করে ধাক্কা দেয়নি। এখন তুমি কী করতে চাও?

এমনিভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে শেষে হাতাহাতি শুরু হলো এবং সব লোক এই গড়গোল দেখে এদিকে-সেদিকে ছুটে পালাতে লাগল। এর মধ্যে সৈনিক ও রাজকুমার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যাক, গড়গোল শেষে খুঁজে পাওয়া যাবে এই মনে করে রাজকুমার একাই নিজে অভিষেক দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে রাজ্যের সব অনাচার তার চোখের উপর ভেসে উঠল। আর তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পরে এইসব অন্যায় ও অনাচার দূর করতে চেষ্টা করবেন।

এদিকে রাজপ্রাসাদে টম ক্যান্টির জন্য আজ দিনটা বড় আনন্দের। তাকে ভালো ভালো কাপড় পরানো হলো। বিভিন্ন খাবারও এল। সে মনে মনে ভাবল রাজা হওয়ায় তারি মজা এবং অভিষেকে যাবার পথে সে আরও আনন্দিত হলো। তার হাতে কয়েক থলি মুদ্রা গরিবের মধ্যে ছুড়ে ছুড়ে তা বিতরণ করার জন্য দেওয়া হলো। সে গাড়িতে বসে ছুড়ে ছুড়ে তা বিতরণ করছিল। এমনি সময় ভিড়ের মধ্যে সে তার মাকে দেখতে পেল এবং তার অজ্ঞানেই তার হাত মাথায় চলে গেল। এদিকে তার মাও তাকে চিনতে পারল, ‘টম আমার টম’ বলে গাড়ির দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু গাড়ির প্রহরীরা তাকে আটকে ফেলল। তখন টম তার মন্ত্রণাদাতাকে বলল, এই প্রৌঢ় মহিলাটি আমার মা। এই কথা শুনে হাটফোর্ড তাড়াতাড়ি আর্চ-বিশপের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন যে, রাজকুমারের পাগলামিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কাজেই অভিষেকের কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করলেই ভালো হয়।

এই কথা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। তারা সবাই যখন দরবারকক্ষে এসে পৌঁছালেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক বালককষ্টে উচ্চারিত হলো : থামো, আমিই হলাম আসল রাজকুমার। দরবারের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে উঠলেন, এই ভিক্ষুক ছেলেটাকে বের করে দাও। কিন্তু সিংহাসন থেকে টম বলে উঠল, না না, সেই সত্যিকারের রাজকুমার। টম ক্যান্টি তখন সব ঘটনা হাটফোর্ডকে খুলে বলল। তখন হাটফোর্ড বললেন, এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা। তবে এই ব্যাপারে একটা মাত্র পরীক্ষা হবে—যার দ্বারা এই ঘটনার ফয়সালা হবে যে কে সত্যিকারের রাজকুমার। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো বড় রাজকীয় সিলটা কোথায় আছে? ভিখারিরূপী রাজকুমার বলল, এ তো অতি সাধারণ প্রশ্ন। আমার কামরায় গিয়ে টেবিলের বামদিকে একটা লোহার পেরেক আছে, সেটা চাপ দিলে একটা গুপ্ত আলমারির দরজা খুলে যাবে, সেখানেই সিলটা পাবেন।

হাটফোর্ড ত্রুটি সিল আনার জন্য চলে গেলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর খালি হাতে ফিরে এসে বললেন, সিলটা পাওয়া গেল না। তখন হাটফোর্ড বললেন, এতে শুধু একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়। ভিখারিরূপী রাজকুমার হাটফোর্ডকে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিকমতো খুঁজে দেখেছেন তো? হাটফোর্ড বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু কোথাও সেই বড় সোনালি গোল সিলটা পাওয়া গেল না। টম বলল, একটা বড় সোনালি গোল সিলের কথা বলছেন, আরে তোমার টেবিলের উপরই ছিল এবং পরে তুমি সেটাকে লুকালে। ভিখারি রাজকুমার বললেন, আর বলতে হবে না মনে পড়ছে। হাটফোর্ড, আমার ঘরে যে লোহার বর্ম আছে তার বাহুর তলে বড় সোনালি সিলটা আছে। আবার হাটফোর্ড দৌড়ে সিলটা খুঁজতে গেল এবং তাড়াতাড়ি ফেরত এসে বলল, আপনাকে সন্দেহ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন হুজুর।

এর মধ্যে সৈনিক মাইলস হেনডেন একদিন পরে এসে প্রাসাদে পৌছালেন। দ্বারী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কী করছ? সৈনিক বললেন, আমি আমার স্বর্গীয় পিতার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দ্বারী বললেন, লোকটাকে সন্দেহ হচ্ছে, তোমরা একে তত্ত্঵াশি করো। তারা তার দেহ তত্ত্বাশি চালিয়ে একটা পত্র পেল। তাতে লেখা : ‘লর্ড হাটফোর্ড সমীপেষ্য, এই পত্রবাহক আমার বন্ধু স্যার মাইলস হেনডেন।’

সৈনিক মাইলসকে রাজকুমারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সৈনিক তখন ভাবছেন : আমি কি স্বপ্ন দেখেছি, না সত্যি? তখন রাজকুমার বলল, হঁ মাইলস, তুমি আমার পাশে বসো, এই অধিকার তোমাকে আগে দেওয়া হয়েছে। তারপর হিউগ হেনডেনকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করা হলো।

হিউগের মৃত্যুর পরে মাইলসের সঙ্গে এডিথের বিয়ে হলো। তিনি তার মা ও বোনদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে বসবাস করতে লাগলেন। রাজকুমারকে যারা সাহায্য করেছিল, সবাইকে পুরস্কৃত করা হলো। আর যারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো।

রাজা এডওয়ার্ডের রাজত্ব খুব ন্যায় ও শাস্তির রাজত্ব ছিল। একদিন রাজকুমার টমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার বড় গোল সিলটার কথা কীভাবে মনে রাখলে? টম বলল, মনে থাকবে না? ওটা দিয়ে তো আমি প্রতিদিন বাদামের খোসা ছাড়াতাম ও বাদাম ভাঙতাম। এটাকে আমি হাতুড়ির মতোই ব্যবহার করেছি।

সার-সংক্ষেপ

রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে মার্ক টোয়েন এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস ‘দি শ্রিস এড দি পপার’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ গল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো কেউ কারো অবস্থানে সন্তুষ্ট নন, অন্যের অবস্থানে সুখ মনে করে। কল্পনাপ্রবণ শিক্ষার্থী যারা কল্পকাহিনী পড়তে ভালোবাসে তাদের জন্য একটি সুখপাঠ্য রচনা এই গল্পটি। এক রাজকুমার ও এক ভিখারির ছেলের কাহিনী নিয়ে গল্পটি রচিত।

যোড়শ শতাব্দীতে লন্ডনে একই সময়ে জন্ম হয় দুটি ছেলের। একজন রাজার ঘরে আর অন্যজন বস্তিতে এক ভিখারির ঘরে। ভিখারির ছেলেটির নাম টম ক্যান্টি। টম ক্যান্টি ছিল কল্পনাবিলাসী। সে সবসময় মনে মনে রাজকুমার হওয়ার বাসনা পোষণ করত। অপর দিকে রাজকুমার রাজপ্রাসাদের সকল নিয়মকানুন, বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে বড় হতে লাগল। একদিন টম হাঁটতে হাঁটতে রাজপ্রাসাদের গেটে এসে সুন্দর পোশাকপরা এক বালককে দেখতে পেল। এই সুন্দর পোশাকপরা ছেলেটিই রাজকুমার। এরপর দুজনের ভাব হয়। দুজন তাদের জীবনের গল্প বলে। একজনের জীবন অন্যজনের কাছে ভালো লাগায় নিজেদের মধ্যে পোশাক বদল করে। এরপর ঘটতে থাকে দুজনের জীবনে নানা ঘটনা।

বিভিন্ন চরাই উত্তরাই পার করে অবশ্যেই টম ও রাজকুমার দুজনই বুঝতে পারে যে তারা নিজ নিজ জীবনেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অন্যের জীবন বাইরে থেকে বর্ণিল মনে হলেও নিজের জীবনই সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক ও পরিপূর্ণ।

শব্দার্থ

রাজকুমার	-	রাজপুত্র, রাজাৰ ছেলে।
রাজপ্রাসাদ	-	রাজাৰ বাসস্থান।
বক্ষিত	-	দরিদ্রগন্ডি।
ভিখারি	-	ভিক্ষুক, অনুগ্রহপ্রার্থী।
পণ্ডিত	-	বিদ্যান, জ্ঞানী।
স্মগ	-	নিদ্রাকালে দৃষ্ট ব্যাপার।
ল্যাটিন	-	প্রাচীন রোমান জাতিৰ ভাষা, রোমান ভাষা।
গোশাক	-	পরিচ্ছদ, জামাকাপড়।
দারোয়ান	-	পাহারাদার।
গুজব	-	জনরব, মুখে মুখে রচিত কথা।
পরামর্শ	-	মন্ত্রণা, যুক্তি।
উপদেষ্টা	-	শিক্ষাদাতা, উপদেশদাতা।
সৈনিক	-	সৈন্য, প্রহরী, যৌদ্ধ।
সরাইখানা	-	পাল্থশালা, পথিক নিবাস।
সন্ধ্যাসী	-	যিনি সংসার ত্যাগ কৰেছেন।
বাগদভা	-	যে কল্যাকে নির্দিষ্ট পাত্ৰেৰ সঙ্গে বিয়ে দেওয়াৰ অজীকাৱ কৰা হয়েছে।
অভিষেক	-	রাজসিংহাসনে আৱোহণেৰ জন্য অনুষ্ঠান।
হোস্টেল	-	ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস।
পানীয়	-	পান কৰাৰ যোগ্য।
গুদামঘৰ	-	মালামাল রাখাৰ ঘৰ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ଟକ କି ରକମ ଛେଲେ?

କ. ଭ୍ରମଣବିଲାସୀ	ଖ. କଲ୍ପନାବିଲାସୀ
ଗ. ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ	ଘ. ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ

୨. ରାଜକୁମାରେର କୋନ କାଜଟି ଟମେର କାହେ ସ୍ଵପ୍ନେର ଘରୋ ମନେ ହେଲିଲା?

କ. ଦାରୋଯାନେର ଖାରାପ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଜନ୍ୟ ଅନୁତଷ୍ଟ ହେଲା	ଖ. ରାଜପ୍ରାସାଦ ସୁରିଯେ ଫିରିଯେ ଦେଖାଲେ
ଗ. ପୋଶାକ ପରିଧାନେର ଅନୁମତି ଦେଓଯା	ଘ. ଟମେର ବଞ୍ଚି ଜୀବନେର କଥା ଶୁଣିତେ ଚାଓଯା

୩. ‘ଆମି ଯେ ଶୁଣେଛିଲାମ ତା ଦେଖିଛି ସତି’— ରାଜା ଏ କଥା ବଲେଛେନ କେନ?

କ. ରାଜକୁମାରେର ପୋଶାକେ ଭିକ୍ଷୁକ ଛେଲେଟିକେ ଦେଖେ	ଖ. ‘ଆପନିଇ ହଲେନ ଏଥାନକାର ରାଜା’— ଟମେର ମୁଖେ ଏ କଥା ଶୁଣେ
ଗ. ଲ୍ୟାଟିନ ଭାଷାଯ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରାଯ	ଘ. ‘ଆମି ଆପନାର ଅଧୀନ ଏକଜନ ଗରିର ପ୍ରଜା’— ଟମ ଏ କଥା ବଲାଯ

୪. ରବିର ବାବା ହତଦରିଦ୍ର ମାନୁଷ । ପୁତ୍ରେର ପ୍ରତି ତାର ଦୟା ନେଇ । ରବିକେ ଦିଯେ କତ ବେଶି କାଜ କରାନୋ ଯାଇ, ପୟସା ରୋଜଗାର କରା ଯାଇ-ଏଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
 ଉଦ୍ଦୀପକେର ରବିର ପିତାର ସାଥେ ନିଚେର କୋନ ଚରିତ୍ରେର ସାଦୃଶ୍ୟ ରଯେଛେ?

କ. ମାଇଲ୍‌ସେର	ଖ. ଜନ କ୍ୟାନ୍ଟିର
ଗ. ଫାଦାର ଏଭୁର	ଘ. ଏଡ଼୍‌ଓୟାର୍ଡର

ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ଅଂଶ ଏକ :

‘ନଦୀର ଏପାର କହେ ଛାଡ଼ିଯା ନିଶ୍ଚାସ
ଓ ପାରେତେ ସର୍ବସୁଖ ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ’

ଅଂଶ ଦୁଇ :

‘ବନ୍ୟୋରା ବନେ ସୁନ୍ଦର, ଶିଶୁରା ମାତୃକ୍ରୋଡ଼େ’ ।

କ. ରାଜକୁମାର ସୈନିକକେ କୋନ ଖେତାବେ ଭୂଷିତ କରେଛିଲେନ?	ଖ. ‘ଟମ କ୍ୟାନ୍ଟି କି ତାକେ ଫାଁକି ଦିଲ ?— ରାଜକୁମାର ଏ କଥା ଭାବତେ ଲାଗଲେନ କେନ ?
ଗ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ‘ଅଂଶ-ଏକ’ ଏ ‘ରାଜକୁମାର ଓ ଭିଖାରିର ଛେଲେ’ ଗଲ୍ଲେର ଯେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଯେଛେ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।	ଘ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ‘ଅଂଶ ଦୁଇ’-ଏ ‘ରାଜକୁମାର ଓ ଭିଖାରିର ଛେଲେ’ ଗଲ୍ଲେର ମୂଳଭାବ ଫୁଟେ ଉଠେଛେ କି? ତୋମାର ଉତ୍ତରେର ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ ଦାଓ ।

২। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার আনাচে-কানাচে গেরিলারা ছেট ছেট স্ফূলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেন। এমনই এক গেরিলা আক্রমণে বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের প্রাণ বাঁচায় এক কিশোর। গুলিতে তার এক পা হারিয়ে গেলেও সে মনে করে তার চেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বেঁচে থাকা জরুরি। দেশ আজ স্বাধীন। এখনও আরেক পা নিয়ে বেঁচে রয়েছেন এক সময়ের কিশোর দীপ্তি। মুক্তিযুদ্ধের সে সময়ের ঘটনা নিয়ে টেলিভিশনে বীরত্ব কাহিনি প্রচারের ফলে মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন খুঁজে পান দীপ্তিকে। নিজে পঙ্গুত্ব বরণ করে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য দীপ্তির প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁর পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

- ক. সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে টম কী নামে পরিচিত?
- খ. ‘যতক্ষণ বেঁচে আছ সুখ সুপ্ত দেখে নাও’- সন্ন্যাসী রাজকুমারকে এ কথা বললেন কেন?
- গ. উদ্দীপকের ‘দীপ্তি’ এর সাথে ‘রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে’ গল্পের ‘সৈনিক’ চরিত্রের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের আকবর হোসেন যেন রাজকুমারেরই প্রতিচ্ছবি- মন্তব্যটি ‘রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

রবিনসন ক্রুশো

ড্যানিয়েল ডিফো

রবিনসন ক্রুশো ইয়র্ক শহরে এক সন্তান পরিবারের ছেলে। ওর বাবা ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং ওর বাবার ইচ্ছে ছিল আইন পাস করে সে ওকালতি করুক। কিন্তু রবিনের ক্ষেমন যেন একটা ঝোক ছিল মাথায় এবং তা ছেলেবেলা থেকেই— তা হলো, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। বিশেষ করে তা যদি সমুদ্রযাত্রা হয় তবে তো কথাই নেই। বড় হয়ে তাই সে তার মা-বাবার কথা না শুনে বাড়ি থেকে না বলে বেশকিছু পাউন্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লন্ডনের উদ্দেশে।

কিন্তু যাত্রার প্রথম থেকেই ওর দুর্ভাগ্য দেখা দিল। ইয়র্ক থেকে লন্ডনে আসার জন্য জাহাজে উঠল কিন্তু জাহাজটি ইয়ারমাউথ নামক স্থানে ডুবে গেল। ভাগ্য ভালো, অন্য একটি জাহাজ যাচ্ছিল ওদের সামনে দিয়ে। ওরা ওদের লাইফবোটে সকলকে তুলে নিল। ক্রুশোর কাছে যা অর্থ ছিল তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত লন্ডন শহরে এসে সে পৌঁছল।

লন্ডনে আসার কদিন পরে জাহাজ-মালিকের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। ভদ্রলোক জাহাজের ব্যবসা করেন এবং এ কারণে প্রায়ই গিনি উপকূলে যাতায়াত করেন। একদিন তিনিই রবিনসনকে বললেন, ‘তুমি যদি কিছু মনিহারি মালামাল নিয়ে আমার জাহাজে করে গিনি উপকূলে যাও তাহলে মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করতে পারবে।’ রবিনসন এই ধরনের কিছু একটা করতে চেয়েছিল। তাই সে লন্ডনে বসবাসরত তার কিছু আভীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু পাউন্ড ধার করল এবং সে ঐ পাউন্ড দিয়ে কিছু প্লাস্টিকের খেলনা, কিছু পুঁতির মালা এবং আরও এমন কিছু কিনে নিল যা ঐ অঞ্চলের লোকজন পছন্দ করবে। এবার ঈশ্বরের নাম নিয়ে গিনির পথে সমুদ্রযাত্রা শুরু হলো।

প্রথম যাত্রাতে ওর মোটামুটি লাভই হলো। অঙ্কের হিসাবে ৫ পাউন্ডের জিনিস সে বিক্রি করেছে ২০ পাউন্ড। এবার ওর আনন্দ দেখে কে! লাভ হলো দুরকম—টাকা তো লাভ হলোই, তার নিজের চেষ্টায় জাহাজ চালানোও কিছু শিখে ফেলল। অবশ্য অল্পতে বেশি লাভের আশায় গিনিতে পরবর্তী যাত্রায় কী ঘটেছিল এবার তার বর্ণনা। গিনি থেকে বাণিজ্য করে ফিরে আসার পথে কয়েকজন মূর জলদস্য ওর জাহাজ আক্রমণ করল, এবং ওকেসহ সবাইকে ধরে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিল।

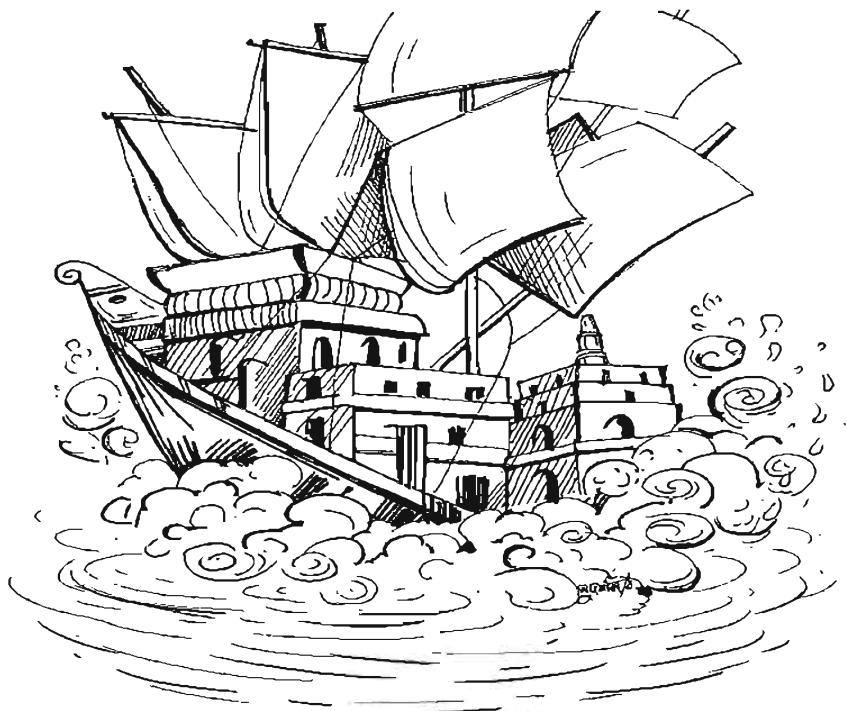
অবশ্য রবিনসনকে যার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল সেই মনিব ছিল খুব ভালো। মনিব ভদ্রলোকের ছিল মাছধরার নেশা। মাছ কী করে ধরতে হয় রবিন তা ভালো করে জানত এবং সেই একটিমাত্র কারণে রবিন মনিবের আরও বেশি প্রিয় হয়ে উঠল।

যা হোক, রবিনসন তার মাথা থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা বাদ দেয়নি। অবশ্য পালিয়ে যাবার পথটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। প্রায় বছর দুই পরে একদিন ওর সুযোগ হলো পালানোর। রবিন ওরই এক সমবয়সী মূর ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছিল মাছ ধরবে বলে। কোশল করে নৌকাটা একটু গভীর সমুদ্রে নিয়ে মূর ছেলেটিকে

ଧାଙ୍କ ମେରେ ଫେଲେ ଦିଲ ସମୁଦ୍ରେ, ଆର ତୟ ଦେଖାଇ ଫିରେ ନା ଗେଲେ ଗୁଣି କରେ ମାରବେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ହଲୋ, ମୂର ଛେଲେଟି ଓକେ ତୟ ନା ପେଯେ ବରଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ରାଜି ହଲୋ । ଛେଲେଟିକେ ରବିନସନ ଆବାର ନୌକାଯ ତୁଳେ ନିଲ ।

ଆବାର ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହଲୋ । ଦୁଦିନ ବେଶ କଟ୍ କରେ ଚଲାର ପର ତାରା ଏକଟା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଜାହାଜେର ଦେଖା ପେଲ । ଜାହାଜ ଓଦେର କାହେ ଆସନ୍ତେଇ ଉରା ଜାହାଜିଦେର ସବ ଜାନାଳ । ଜାହାଜିରା ଓଦେର ତୁଳେ ନିଲ ଜାହାଜେ ଏବଂ ରବିନସନକେ ଏନେ ନାମିଯେ ଦିଲ ବ୍ରାଜିଲେର ବନ୍ଦରେ ଏବଂ ଜାହାଜି ନିଜେର ଜନ୍ୟ ମୂର ଛେଲେଟିକେ ଝରେ ଦିଲ ।

କିଛିଦିନ ବ୍ରାଜିଲେ ଓର ବେଶ ସୁଖେଇ କାଟିଲ । ଅନାବାଦି ଜମିତେ ଚାଷାବାଦ କରେ ନିଜେର ଅବସ୍ଥା ଫିରିଯେ ଏନେହିଲ ରବିନ । କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳା ଥେକେ ଅଛୁରାଟିତ ରବିନେର ମାଥାଯ ଆବାର ଦୂର୍ବଳ ଚାପଲ । ଓଖାନକାର ଶ୍ୟାମୀଯାରା ଓକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଲ ଆବାର ଗିନିର ସେଇ ପୁରୋନୋ ବାଣିଜ୍ୟଟା ଶୁରୁ କରତେ । ଓର ତୋ ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରାର ପୁରୋନୋ ନେଶା ଆହେଇ । ତାଇ ଏକଦିନ ଆବାର ତୋଡ଼ଜୋଡ଼ କରେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲ ଗିନିର ଉଦ୍ଦେଶେ ।



ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ କରେକଟା ଦିନ ବେଶ ଭାଲୋଇ ଯାଛିଲ, ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ଉଠିଲ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝାଡ଼ । ସେଇ ଝାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଓଦେର ଜାହାଜ ଗିଯେ ଆଟିକେ ଗେଲ ଏକ ଅଜାନା ଚଢାଯ । ଆର ଚଢାଇର ବାଲିତେ ଜାହାଜେର ତଳା ଗେଲ ଭୀଷଣଭାବେ ଫେଁସେ । ତବୁ ଅନେକ ଭେବେ ଉରା ଜାହାଜେ ରକ୍ଷିତ ହେଟ ନୌକାଯ କରେ ଡାଙ୍ଗାର ଦିକେ ରଖନା ହେଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଧି ବାମ, ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଏକ ସମୁଦ୍ରେର ଟେଟ୍ ଏସେ ଓଦେର ନୌକଟା ଉଠିଲ ଏବଂ ଉରା ସବାଇ ଝୁବେ ଗେଲ । ରବିନସନେର ଭାଗ୍ୟ ଭାଲୋ ବଣାତେ ହବେ, ସେ ଭେଦେ ଉଠିଲ ଏବଂ ସ୍ନାତାର କେଟେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥା କୁଳେ ପୌଛିଲ । ସେଇ ରାତଟା ସେ ବନ୍ୟ ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵର ଡୟେ ଏକଟା ଗାଛେର ଉପର ବସେ କାଟିଯେ ଦିଲ ।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই দেখল আকাশ পরিষ্কার, বাড়ি উঠেছিল বলে মনেই হয় না। আরও আশ্চর্য, বাড়ির বেগ ওদের বড় জাহাজটাকে প্রায় ডাঙ্গাতেই নিয়ে এসেছে। রবিনসন ভাবল, আমরা যদি জাহাজেই থাকতাম তাহলে কাটুকেই মরতে হতো না।

এখন আর তেবে কী হবে? রবিনসনের খিদেও পেয়েছে পচণ্ড। সে আবার জাহাজে গিয়ে উঠল এবং খুঁজে দেখল খাবারগুলো ঠিক আছে কি না। খাবার ঠিকই ছিল। সে বেশ পেট পুরে খেয়ে নিল। তারপর জাহাজ থেকে কয়েকটা তন্তুকাঠ আর ছুতোরের যত্নপাতি তীরে এনে কোনো রকমে রাত কাটানোর মতো একটা মাচা তৈরি করে নিল। তারপর বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্বীপটা ভালো করে দেখার জন্য। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠেই রবিনের মনটা দমে গেল। স্ট্রেচাই জানেন কতদিন থাকতে হবে এই দ্বীপে।

রাতে অবশ্য কোনো রকম ঝামেলা হলো না। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে রবিন স্থির করল, প্রয়োজনীয় যা কিছু জাহাজে এখনও ভাগো আছে তা সবই নামিয়ে আনতে হবে।

সেদিন থেকে সময় পেলেই ভাটার সময় পানি কমতেই সে জাহাজে চলে যেত এবং নামিয়ে আনত প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র। বেশিদিন সময় পেলে রবিনসন হয়তো পুরো জাহাজটাই ডাঙ্গায় তুলে নিয়ে আসত। পারল না, কারণ চৌদ্দ দিনের মাথায় এমন বাড়ি উঠল তাতে ঐ ভাঙ্গা জাহাজটা বাড়ে কোথায় উঠে গেল তার কোনো চিহ্নও পাওয়া গেল না।

অবশ্য জাহাজ থেকে রবিন কম জিনিস নামিয়ে আনেনি। এখন এসব জিনিস রাখবে কোথায় সেটাও এক ভাবনা। অনেক খুঁজে একটা পাহাড়ে উঠার মধ্যপথে খানিকটা সমতল জায়গা আবিষ্কার করল। ওর উল্টো দিকে উঠে গেছে একটা খাড়া পাহাড়, সেদিক থেকে কোনো বন্য জানোয়ারের আক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম। আর বাদবাকি তিনদিকে সে নারকেল পাতা দিয়ে বেশ শক্ত এবং উঁচু করে বেড়া দিয়ে দিল। প্রয়োজন হলে মই লাগিয়ে সে যাতায়াত করত, আর ভিতরে ঢুকেই মইটা তুলে নামিয়ে রাখত মাটিতে।

সব জিনিসপত্র রাখল সেখানেই। তৈরি করল বড় করে একটা থাকার মতো ছাউনি। তাছাড়া পাহাড়ের একটা অংশে প্রকাণ্ড এক গর্ত ছিল, সেটাও যোগ করে নিল ঘর হিসেবে।

থাকার মতো বাসা তৈরি হয়ে গেল ওর। ভাবল তৈরি করতে হবে কিছু আসবাবপত্র। যদিও এসব তৈরির অভিযন্ত্র ওর নেই। যন্ত্র ব্যবহার করতে ওর খুব কষ্ট হলো। প্রথমে বন থেকে কাঠ নিয়ে তৈরি করল একটা চেয়ার। তারপর টেবিল, শেলফ, আরও কত কী! একধরনের শক্ত জলাগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি করল একটা কোদাল আর জাহাজের ভাঙ্গা একটা লোহার টুকরো পুড়িয়ে পিটিয়ে তৈরি করল জ্বালানি কাঠ কাটা কুড়াল।

এর মধ্যে ঘটল এক মজার ঘটনা। রবিনসন জাহাজ থেকে নামানো জিনিসপত্র নাঢ়াচাড়া করতেই পেল একটা ছোট থলে, খুলে দেখল তাতে রয়েছে কতকটা তুষ। থলেটা ওর দরকার ছিল ভিন্ন কারণে, তাই ঘরের বাইরে এসে তুষগুলো মাটিতে ফেলে দিল।

এর কিছুদিন পরেই নামল বর্ষা এবং বৃষ্টি। বৃষ্টি হবার কয়েক দিন পরেই রবিনসন আশ্চর্য হয়ে দেখল, যে তুষগুলো সে ফেলেছিল সেখানে অজানা গাছের বেশকিছু অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। রবিনসনের খুব আনন্দ হলো। সে কোদাল দিয়ে সামনের আরও কিছু জমি কুপিয়ে তৈরি করে রাখল। একদিন দেখল অঙ্কুরগুলো

আসলে ধানগাছের সাথে যবও আছে। একদিন ধান আর যব গাছগুলো একটু বড় হলে সে তা চ্যাজমিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বুনে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ জমি থেকে বেশকিছু ধান ও যব পেল।

এবার রবিনসনের ভাবনা— এগুলো মাড়াই করবে কীভাবে? তাছাড়া চাই জাতাকল আর বুটি সেঁকবার জন্য তাওয়া। যাই হোক, বুদ্ধিমান রবিন শক্ত কাঠ দিয়ে জাঁতা তৈরি করল, আর নরম মাটি থালার মতো পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করল তাওয়া।

এবার বড় সমস্যা হলো পোশাকের। জাহাজে যা ছিল তাতে আর কতদিন চলে? সেই বনে তো আর যাই হোক, পোশাক বা তৈরি কাপড় পাওয়া যাবে না। তখন আবার নতুন বুদ্ধি আঁটল রবিন— ঘরে রাখা ছিল বেশকিছু শুকনো ছাগলের চামড়া— সে ঐ চামড়া দিয়েই লজ্জা ঢাকার মতো পোশাক তৈরি করে নিল। গালভর্টি দাড়ি-গৌফ আর তার উপর ছাগলের চামড়ার পোশাক— যা একখানা চেহারা হয়েছে রবিনসনের! ওভাবে দেখলে ওর স্বজ্ঞাতি হয়তো অজ্ঞান হতো কিংবা ধরেই নিত রবিনসন পাগল হয়ে গেছে।

রবিনসনের আরও একটা মজার কথা হলো পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীন এক দ্বীপে বাস করলেও সে দিন-মাস বছরের হিসাব ঠিক ঠিক রেখেছিল। যেদিন রবিনসনের নৌকোড়ু হয় সেদিনের তারিখ ওর জানা ছিল। তারপর থেকেই রবিন প্রতিদিন পাহাড়ের গায়ে পরপর তারিখ লিখে ক্যালেন্ডার তৈরি করে রেখেছিল। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে একটা করে তারিখ কেটে দিত সে। ঠিক বর্তমানের ডেটকার্ড বদলানোর মতো।

এভাবেই রবিনসনের দিনের পর দিন কাটতে লাগল। রবিনসন ঐ দ্বীপের মুকুটহীন রাজা। যতদূর দৃষ্টি যায় সবটাই ওর রাজত্ব। রবিনসন যখন খেতে বসত তখন ওর সব কুকুর-বেড়াল বসত চারপাশে, তা দেখে মনে হতো রবিনসন রাজা আর ওরা সব যেন প্রজা, প্রজারা যেন সব ওর করুণাপ্রত্যাশী। কিন্তু এভাবে বেশিদিন কাটল না, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল নতুন এক অশান্তি।

রবিনসন একদিন বেলাভূমিতে হাঁটছিল বালি কেটে কেটে নানান ভাবনা মাথায় নিয়ে। এর মধ্যেই হঠাৎ তার চোখ স্থির হয়ে যায় বালির উপর প্রকাণ এক পায়ের ছাপ দেখে। কিন্তু কোথাও জনমানব নেই, এই ছাপ এল কীভাবে, চিন্তা ওখানেই। কোনো কিছুর সন্ধান পেল না বলেই ওর ভীষণ ভয় হলো। শেষে এমন হলো, দিনে ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করলেও রাতে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখল, কিছু লোক ওকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। অবশ্য ওর ঘর খুব মজবুত করে তৈরি। তবু রবিন আবার দিগ্বুণ দেয়াল তৈরি করল, যাতে করে ওর ঘর শত্রুর কাছে দুর্ভেদ্য হয়। অবশ্য তাতেও রবিনসনের পুরো ভয় কাটল না।

যাই যাই করে এভাবে কেটে গেল প্রায় দুটি বছর। রবিনসন এখন সেসব ভয়ের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। এমনি এক সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে যেতেই দেখতে পেল পাঁচখানা নৌকা সাগরের তীরে বাঁধা। আরও স্পষ্ট করে দেখার জন্য রবিনসন পাহাড়ের উপর উঠল। সেখান থেকে যা দেখল, তাতে ওর হাত-পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয় আর কি!

রবিনসন দেখল প্রায় জনা ত্রিশেক লোক বিরাট এক আগুনের কুণ্ডলীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে এবং বিদঘুটে আর বীভৎস রকমের চিঢ়কার করছে। একটু পরেই ওরা দুজন লোককে ওদের সেই নৌকা থেকে

টানতে টানতে তীরের বালিতে নামিয়ে নিয়ে এল। একজনকে তো সাথে সাথেই মেরে ফেলল। আর অন্যজন ওদের একটু অসাবধানতার সুযোগ পেয়ে দৌড় দিল। তিনজন লোক ছুটল ওর পিছু পিছু ওকে ধরতে। কিন্তু লোকটি ছুটছে প্রাণের দায়ে, তার সাথে ওরা পারবে কেন? ঐ লোকটি সোজা ছুটে আসছিল, রবিনসন ঘোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে সব দেখছে। প্রথমে ওর ভীষণ ভয় হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল ওদের মধ্যে একজন ফিরে যাচ্ছে, তখন রবিনসন বাকি দুজনের হাত থেকে ওকে বাঁচাবে স্থির করল। ওর হাতে ছিল বন্দুক, মধ্যে একটা লোক, রবিনসনের নাগালের মধ্যে আসতেই কবে দিল এক ঘা। সে অঙ্গান হয়ে পড়ে রইল। এদিকে অন্য লোকটি রবিনসনকে নিশানা করে তীর ছুঁচ্ছে দেখেই বাধ্য হয়ে সে গুলি করল। দ্বিতীয় লোকটি মারা গেল।

যারা তিনজন এসেছিল ওদের তো ব্যবস্থা ভালোই হলো। কিন্তু রবিনসনের বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে এবার যাকে সে বাঁচাল সে-ই উঠে ভয়ে দিল তো দৌড়। অতিকফ্টে রবিন ওকে দৌড়ে ধরে আনল এবং তার তয় ভাঙিয়ে দিল। তখন লোকটি বারবার ওর পায়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাল।

রবিনসন ওকে এবার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছু খেতেও দিল, তারপর বিছানা দেখিয়ে বলল ঘুমোতে। লোকটি তয়ে, ক্ষুধায়, তৃক্ষণায় প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল, এবার ঘুমিয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠেই আবার সে রবিনসনের পা নিজের মাথায় রেখে ওদের প্রথামতো বশ্যতা মেনে নিল।

এই পুরো ঘটনাটাই ঘটেছিল ইংরেজি ফ্রাইডে, মানে শুক্রবারে। তাই রবিনসন ওর নাম রাখল ফ্রাইডে। এতদিন বেচারা রবিনসন ছিল একা দ্বিপ্রাসী। এবার তার দোসর হলো। ফ্রাইডে কথা বলতে জানত না, তাকে খুব যত্ন করে রবিন কথা বলা শেখাল। এমনিতে ফ্রাইডের মাথা খুব পরিষ্কার, যাকে বলে শার্প। সে অঞ্চলিনের মধ্যেই সব কাজকর্ম শিখে নিল। এছাড়া ওর মনিবের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে রবিনসন খুবই মুগ্ধ হয়। তাইতো পরবর্তী জীবনে রবিনসন ক্রুশো বারবার বলত- ‘অমন বিশ্বাসী ভৃত্য বোধ হয় কেউ কোনোদিন পায়নি, যেমনটি ছিল ফ্রাইডে।’

এভাবে এই নিয়ম দ্বাপে কেটে গেল সাতাশটি বছর। এই সাতাশ বছরে রবিনসনের আরও দুজন সঙ্গী হলো, ওরা কী করে এল শোনো।

পূর্বের মতো একদিন রবিনসন আবিষ্কার করল সমুদ্রতীরে তিনখানা নৌকা। রবিনসন দূরবীন দিয়ে দেখল, আগের মতোই কিছু বর্বর লোক দুটি লোককে বেঁধে রেখেছে, প্রহার করছে এবং আয়োজন চলছে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলবার। তখন রবিনসন আর ফ্রাইডে বন্দুক নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। এতে মাত্র চারজন ছাড়া সবাইকে মেরে ফেলল ওরা দুজনে। বাকি চারজন আধমরা অবস্থায় কোনোরকমে ওদের এক নৌকা নিয়ে পালাল। ফ্রাইডে এবং রবিনসন তখন বল্দি দুজনকে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে সুস্থ করে তুলল। এদের একজন স্পেন দেশের লোক আর অন্যজন ফ্রাইডের স্বজ্ঞাতি। ফ্রাইডে কিন্তু তাকে দেখেই ছুমুতে ছুমুতে গাল ভরে ফেলল। অস্থির করে তুলল লোকটিকে। কিছু পরে জানা গেল লোকটি আসলে ফ্রাইডের বাবা।

ওরা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ওদের কাছ থেকে রবিনসন জানতে পারল ডাঙার কাছেই একটা জাহাজডুবি হয়েছে, তাতে কয়েকজন স্যানিশ এবং কয়েকজন পর্তুগিজ ছিল যাদের ধরে নিয়ে গেছে। এদিকে তাদের না আছে অস্ত্র, না আছে কোনো যন্ত্রপাতি। রবিনসন ওদের সব কথা শুনে নিজের দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে সম্ভব হলো, কিন্তু শর্ত হবে যে, তারা এখানে সবাই রবিনসনের বশ্যতা স্থিকার করে নেবে এবং কখনো কেউ রবিনসনের বিরোধিতা করবে না। এই শর্তের কারণটাও রবিনসন ওদের বুবিয়ে বলল, তা হলো, মানুষের সাধারণত স্বভাব হচ্ছে এমন, বিপদের সময় যে উপকার করে, বিপদ কেটে গেলে উপকারীর অপকার করতে ঐ মানুষের মনে বাধে না। এ ক্ষেত্রে বনের পশু বরং উন্নত প্রাণী।

রবিনসন আর ফ্রাইডে ওদের দ্বীপ থেকে ডাঙায় আনার জন্য একটা নৌকাতে ছাউনি তৈরি করল, সাথে রাইল খাবার পানি। তারপর সেই নৌকা করেই ফ্রাইডের বাবা আর স্যানিশ খালাসিটি ঐ অভাগাদের উদ্বারে যাত্রা করল।

আরও কিছুদিন পরে একদিন ফ্রাইডে এসে রবিনসনকে খবর দিল, দূরে আবারো একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। রবিনসন খবরটা পেয়ে বেশ খুশিই হলো- তবু মনের সন্দেহ দূর করতে কী উদ্দেশ্যে জাহাজটি এদিকে আসছে বুঝতে না পেরে আড়াল থেকে ব্যাপারটা পরখ করতে লাগল। ভাবখানা এই, দেখাই যাক না—কী হয়!

জাহাজ তীরের কাছে এসে নোঙ্গর ফেলল, তারপর ঐ জাহাজের লোকেরা নৌকা করে এসে দ্বীপে নামল। আরও একটু সতর্কভাবে দেখে রবিনসন বুঝতে পারল ওরা সবাই শ্বেতাঙ্গ—ইংরেজ, ওর স্বজাতি। আর এই দলের তিনজন লোকের হাত-পা বাঁধা, ওরা বন্দি। যাই হোক, নৌকার লোকগুলো ঐ তিনজনকে চড়ায় ফেলে দিয়ে দ্বীপের ভিতর ঢুকল আর সেই ফাঁকে রবিনসন ওদের বন্দিত্বের কারণটা জেনে নিল।

ওরা বুঝতেই পারছিল না ওরা কোন জাতির লোক, কারণ কেউ কথার উত্তর দিচ্ছিল না। অবশ্য শেষে বুঝতে পারল ওরা রবিনসনেরই স্বজাতি। তাই তারা জানাল, জাহাজের খালাসিরা ঘড়্যন্ত করে ক্যাপ্টেন আর মেটদের বন্দি করেছে, তাদের ইচ্ছে ওদের এই নিয়ুম দ্বীপে ফেলে জাহাজ নিয়ে পালাবে। রবিনসন ও ফ্রাইডে তাড়াতাড়ি ওদের বাঁধন খুলে দিল এবং তিনজনের হাতে তিনটি বন্দুক দিল আত্মরক্ষার জন্য। তারপর পাঁচজন মিলে ওদের খুঁজে বের করল। পুরো যুদ্ধের মতো আক্রমণ করল।

ঐ দুষ্টদলের চাই ছিল দুজন, প্রথমেই তাদের মেরে ফেলাতে সমস্ত ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল। আর বাদবাকি যারা ছিল তারা সবাই রবিনসনের কাছে আসাসমর্পণ করল। ক্যাপ্টেন তখন ঐ তিনজনের সাহায্যে তাদের বন্দি করে ফেলল।

রবিনসন ক্রুশোর জন্যে শুধু ওদের প্রাণই বাঁচাল না, জাহাজটি পর্যন্ত ফিরে পেল। আর সে ক্রতৃপক্ষতায় ওরা রবিনসনকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। রবিনসন ক্রুশো স্যানিশদের জন্যে অপেক্ষা না করে, যা—কিছু ব্যবহারের জিনিসপত্র ছিল সব গুচ্ছিয়ে রেখে সেগুলো তাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে ফ্রাইডেকে নিয়ে জাহাজে উঠল।

আটাশ বছর পরে এই এতদিনের অজানা দ্বীপ ছেড়ে রবিনসন ক্রুশো দেশের দিকে চলল এবং পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার দেশের মাটিতে পা দিল।

সার-সংক্ষেপ

এই গল্পটি ড্যানিয়েল ডিফো রচিত ‘রবিনসন ক্রুশো’ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে টিকে থাকা একজন মানুষের গল্প বর্ণিত হয়েছে এখানে।

রবিনসন ক্রুশো ইংল্যান্ডের অধিবাসী। তার পিতার ইচ্ছা ছিল রবিনসন আইন পাশ করে ওকালতি করবে। কিন্তু রবিনের বোঁক ছিল দেশে ঘুরে বেড়ানোর দিকে। পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করে। প্রথম যাত্রায় তার বেশ লাভ হলেও পরবর্তী যাত্রায় তার উপর নেমে আসে দুর্যোগ। কিছুদিন ত্রৈতাস হিসেবে জীবন্যাপনের পর তার আবার সুযোগ আসে সমুদ্রযাত্রার। ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে লঙ্ঘণ হয়ে যায় তাদের জাহাজ। রবিনসন একাই বেঁচে থাকেন ঐ জাহাজে। আশ্রয় নেন এক অচেলা দ্বীপে। সঙ্গীহীন অবস্থায় কাটিয়ে দেন বছরের পর বছর। সাংসারিক জীবনের কিছুই না জানা রবিনসন পাটু হয়ে উঠেন নানা কাজে। ঘটনাবৃত্তে তার জীবনে আসে এক ভূত্য। ভূত্যের নাম রাখেন ফ্রাইডে। একদিন এক বৃটিশ জাহাজ ভিড়ে ঐ দ্বীপে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে প্রাণে বাঁচায় রবিনসন। সদাশয় ক্যাপ্টেন তার জাহাজে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার জন্য রবিনসনকে অনুরোধ করেন।

ঘটনাবৃত্ত এবং রোমাঞ্চকর এক জীবন কাটানোর পর অবশেষে রবিনসন ক্রুশো তার নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ৩৫ বছর পর নিজ দেশে ফিরে আসেন। অনেক বাধা বিপত্তি স্বত্বেও রবিনসন সমুদ্র অমন উপভোগ করেন।

শব্দার্থ

সম্ভাস্ত	-	তদ্রু।
ওকালতি	-	আইন ব্যবসা।
সমুদ্রযাত্রা	-	সাগরপথে বিদেশ গমন।
পাউন্ড	-	ব্রিটিশ মুদ্রার নাম।
ভরসা	-	নির্ভরতা।
ধার	-	কর্জ
পথ্য	-	পথ, রাস্তা।
তৃষ্ণ	-	ধানের খোসা।
অঙ্কুর	-	বীজ থেকে গজানো কচি চারা গাছ।
পরামর্শ	-	মন্ত্রণা, বিচার।
দুর্বৃদ্ধি	-	খারাপ চিন্তা, দুষ্টবুদ্ধি।
বাণিজ্য	-	ব্যবসা।
ছাউনি	-	তাঁবু, শিবির।
বীতৎস	-	বিকৃত, ভয়াল, অতি কদর্য।
দূরবীন	-	দূরের জিনিস কাছে দেখার যত্ন।

- খেতাজা - সাদা বর্ণের মানুষ।
 আবিষ্কার - উত্তীর্ণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রবিনসন ক্রুশোর বাবা ছেলেকে কী বানাতে চেয়েছিলেন?
 ক. ব্যবসায়ী খ. আইনজীবী
 গ. নাবিক ঘ. পর্যটক
২. মনিব অদ্রলোককে কীভাবে রবিনসন ক্রুশো খুশি করেছেন?
 ক. গ্রীতদাস হয়ে খ. পোশাক দিয়ে
 গ. মাছ ধরে ঘ. দ্বিপে নিয়ে
৩. রবিনসনকে দ্বিপের ‘মুকুটহীন রাজা’ বলার কারণ -
 i. তিনি ব্যতীত আর কেউ রাজা হবার উপযুক্ত নন
 ii. সব পশুপাখিকে তার করুণাপ্রার্থীর মতো মনে হতো
 iii. যতটুকু দৃষ্টি যায় দ্বিপের ততটুকুর একমাত্র অধিপতি ছিলেন তিনি।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. iii
 গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাফলৎ বেড়াতে গিয়ে শেফালি পাহাড়ি বর্ণ দেখে মুক্ষ হয়। ফিরে আসার সময় তার মন উদাস হয়ে যায় আর তাবে যদি আবার সে এখানে আসতে পারতো! যদি এমন সৌন্দর্য আর কোথাও আছে কী না তা দেখতে পেতো।

৪. শেফালি ‘রবিনসন ক্রুশো’ গল্লের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
 ক. মনিব অদ্রলোক খ. রবিনসন ক্রুশো
 গ. সহচর ফ্রাইডে ঘ. স্প্যানিশ খালাশি
৫. শেফালির মানসিকতা ‘রবিনসন ক্রুশো’ গল্লের কোন ভাবটি প্রকাশ করে?
 ক. আকৃতিক সৌন্দর্য প্রীতি খ. উদাসী মনোভাব
 গ. ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা ঘ. জীবনযাত্রায় বৈচিত্রতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পিতৃহারা মনিরকে তার চাচা শহরে নিয়ে আসেন এবং ক্ষুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু ফেলে আসা গ্রামের সবুজ মাঠ, নদী বারবার তার মনে পড়তে লাগলো। চাচা মনিরের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে বেড়াতে নিয়ে যান। এতে তার মন ভালো হয়ে গেল। অতি দ্রুত সে নিজেই শহরের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে গেলো। নিয়ন্ত্রন জায়গা ভ্রমণ করে সে শহরটিকে আপন করে নিলো।

ক. রবিনসন ক্রুশোকে কারা ছীতদাসরাপে বিক্রি করেছিল?

খ. দ্বিপে রবিনসন কীভাবে ফসল উৎপাদন করেছিলেন?

গ. মনিরের বৈশিষ্ট্যের কোন দিকটি বরিনসন ক্রুশোর মধ্যে অনুপস্থিত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নতুনকে গ্রহণ করার সামর্থ্য বিবেচনায় মনির ও রবিনসন ক্রুশো একই মানের'-বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

২. শীতের ছুটিতে রহমান বন্ধুদের সাথে গ্রামে বেড়াতে গেল। একদিন সবাই যিলে পাশের বনে চুকলো পাখি দেখার জন্য। শহরের ছেলে রহমান বড় বড় গাছে ঢাকা অঙ্কুরার বনে পথ হারিয়ে ফেললো। প্রথমে ভয় পেলেও সে মনে সাহস সঞ্চার করলো এবং কর্কশ শব্দ সহ্য করেও রাতে গাছের ডালে বসে থাকলো। পরদিন পথ বের করার জন্য চিহ্ন ধরে ধরে এগলো ও ফল পেড়ে খেয়ে ক্ষুধা যেটাল। মনের জোর ও বৃদ্ধিবলে দুর্দিন পর সে ঠিকই গ্রামে ফিরে এল।

ক. ফ্রাইডে কে?

খ. অজানা দ্বিপে কীভাবে রবিনসন পোশাক পেল?

গ. উদ্বীপকটি কোন দিক থেকে 'রবিনসন ক্রুশো' গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রহমান যেন রবিনসন ক্রুশোর প্রতিচ্ছবি' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

সোহরাব রোস্তম

মূল: মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী

বৃত্তান্ত: মমতাজউদ্দীন আহমদ

ইরানের পরাক্রমশালী রাজা ফেরিদুর কনিষ্ঠপুত্র রাজা ইরিজির কন্যা পরীচেহেরের পুত্র শাহ মনুচেহের যখন ইরানের রাজা হলেন, তখন তাঁর সৈন্যদলে নামকরা বীর যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন শাম নামে একজন বীর যোদ্ধা। শাম বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই মনে অনেক দুঃখ। পুত্রের আশায় বীর শাম দেবতার মন্দিরে মাথা ঠুকে মরেন। অবশেষে দেবতার আশীর্বাদে বীর শাম এক পুত্র লাভ করলেন। পুত্রের নাম রাখলেন জাল।

বলিষ্ঠদেহী জাল দেখতে সুন্দর কিন্তু তার মাথার সব চুল ধ্বনিবে সাদা। সাদা রঙের চুলওয়ালা ছেলে অভিশাপ দেকে আনতে পারে। এই রকম নানা আশঙ্কার কথা শুনে শাম নিজের হাতে নিজের পুত্রকে ফেলে এলেন আলবুরজ পর্বতে। কিন্তু দেবতারা ছিল শিশু জালের প্রতি দয়াশীল। ইগল পাথির মতো ঠোঁট এবং সিংহের মতো পা-বিশিষ্ট সি-মোরগ পাথি উড়ে এসে ঠোঁটে ঝুলিয়ে জালকে নিয়ে গেল। জাল পাথির বাসায় বড় হতে লাগল।

পুত্রকে ফেলে এসে বীর শাম পুত্রশোকে কাতর হয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি আবার দেবতার মন্দিরে ছেলের জন্য মাথা ঠুকতে লাগলেন। সি-মোরগ পাথি জালকে ফেরত দিয়ে গেল এবং যাবার সময় নিজের পাখনা থেকে একটি পালক ছিঁড়ে উপহার দিয়ে বলল ‘বিপদের সময় এ পালকটি আগুনে তাতালেই আমি সাহায্যের জন্য ছুটে আসব।’

বাদশাহ মনুচেহের কিশোর জালকে দেখে খুশি হলেন। জালকে উপহার দিলেন তেজি ঘোড়া এবং শামকে দিলেন জাবুলিস্তানের শাসনভার। ক্রমে ক্রমে জাল অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। পিতা শাম গেলেন রাজার আদেশে মাজেন্দ্রানের দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুবক জাল জাবুলিস্তানের শাসনভার পরিচালনা করছে।

একবার যুবক জাল গেলেন কাবুল-রাজা মেহেরাবের রাজ্যে বেড়াতে। রাজা মেহেরাবের সুন্দরী কন্যা রুদাবার সঙ্গে প্রণয় হলো জালের এবং অবশেষে সকলের সম্মতি নিয়ে জাল ও রুদাবার বিবাহ সম্পন্ন হলো।

আনন্দে দিন কাটে নবদম্পত্তির। কিছুদিনের মধ্যে রুদাবার হলো কঠিন অসুখ। কত ওষুধ, বদ্য, কিন্তু অসুখ সারে না। জাল তখন সি-মোরগের পালক ধরল আগুনের তাপে। সি-মোরগ উড়ে এসে হাজির হলো। সি-মোরগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগিণীর রোগ পরীক্ষা করে বলল, ওহে ভাগ্যবান জাল, তুমি অতিসত্ত্ব পিতা হতে চলেছ। তোমার পত্নী রুদাবা এমন এক সন্তানের মা হতে চলেছে, যে সন্তানের নাম পৃথিবীতে খ্যাত হবে তার বীরত্ব ও সাহসের গুণে।

সি-মোরগের কথা মিথ্যা হবার নয়। জাল এক শক্তিমান এবং বলবান পুত্রসন্তান লাভ করলেন। এই ছেলেই মহাবীর রোস্তম। ইরানের জাতীয় ইতিহাসে যার নাম এখনও অক্ষয় অমর হয়ে আছে।

শৈশবেই রোস্তমের মধ্যে বীরত্বের লক্ষণ ফুটে উঠল। সে তেজি ঘোড়ায় চড়ে দূরস্থিতে ছুটতে ভালোবাসে, আর ভালোবাসে গদা ও গর্জ নিয়ে যুদ্ধ করতে। সামান্য খাদ্যে তার ক্ষুধা মেটে না। এক দাইমায়ের দুধপান করে তার ত্বক্ষা নিবারণ হয় না। সে পাঁচটি ছাগলের মাখসের কাবাব দিয়ে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে।

একদিন রাজার মন্ত্র হাতি শিকল ছিড়ে রাজপথে ছুটছে। হাতির পায়ের নিচে পড়ে মানুষ জীবন দিচ্ছে কিন্তু সাহস করে কেউ মন্ত্র হাতির মুখোযুথি হচ্ছে না। কিশোর রোস্তম গদা নিয়ে পাগলা হাতির সামনে ছুটে এল এবং গদার এক আঘাতে হাতিকে ধরাশায়ী করল। বীর রোস্তম অঙ্গের সোগান্দি দুর্গে কৌশলে প্রবেশ করে দুর্গের সর্দার ও সিপাহিদের হত্যা করে পিতামহের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এল। পিতা জাল বীরপুত্র রোস্তমকে আলিঙ্গন করলেন। কেননা তিনি বারবার এ দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন। আজ পুত্রের শৌর্যে পিতার বুক গর্বে ফুলে উঠেছে।

তুরানের সেনাপতি আফরাসিয়াব ইরান আক্রমণ করে রাজা নওদরকে হত্যা করলেন এবং জালের রাজ্য জাবুলিস্তান আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। পিতা জালের সঙ্গে পুত্র রোস্তমও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধসাজ পরলেন। আস্তাবলে প্রবেশ করে সবচেয়ে দুরস্থ ও অবাধ্য যে ঘোড়া রখ্শ তাকেই নির্বাচন করলেন রোস্তম। রাক্ষস বৎশের রখ্শ এতদিনে প্রকৃত মনিবকে পেয়ে মহানশ্দে হেষাবনি করল। বীর রোস্তম রংধনু রঞ্জের রেশমি পোশাক পরলেন। মাথায় তাজের উপর ঝুলালেন রেশমের বর্ণাত্য ঝুমাল আর হাতে তুলে নিলেন পিতামহ শামের সেই বিখ্যাত গদা।

রোস্তম যুদ্ধে চললেন, কিন্তু বুকে ও বাহুতে নেই লোহার বর্ম। যে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। যুদ্ধে তুরাণি সৈন্যদের পিছু হটতে হলো। তরুণ রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে স্বয়ং সেনাপতি আফরাসিয়াব কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

বীর রোস্তম হলেন ইরানের মহাবীর রোস্তম। রোস্তম ইরানের স্বাধীনতা উদ্ধার করলেন। রাজা কায়কোবাদ রাজসিংহাসনে বসলেন। জনগণ মহাবীর রোস্তমের জয়গানে ইরান মুখরিত করল। সুখে-শাস্তিতে ইরানবাসী দিনান্তিপাত করতে লাগল।

কিন্তু রাজা কায়কোবাদের পর রাজা কায়কাউস রাজা হলেন। কায়কাউস ছিলেন খেয়ালি এবং চাটুকারিতাপ্রিয় রাজা। চাটুকারদের প্রশংসায় বিভাস্ত হয়ে কায়কাউস দৈত্যদের রাজ্য পাহাড়ি দেশ মাজেন্দ্রান জয় করতে ছুটে গেলেন। মাজেন্দ্রানের রাজা প্রতিবেশী বন্ধু মহাবলী সফেদ দৈত্যের সাহায্যে রাজা কায়কাউসের বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে রাজা কায়কাউসকে বন্দি করে রাখলেন।

ইরান রাজার এ বন্দিদশার সংবাদ পৌঁছাল জাবুলিস্তানে। মহাবীর রোস্তম রখ্শের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটলেন দৈত্যরাজ্য মাজেন্দ্রানে। দীর্ঘ পথ, পায়ে পায়ে বিগদ আর ছলনা। অপরিসীম মনোবলের অধিকারী রোস্তম সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অবশেষে আলবুরজ পর্বত ডিঙিয়ে এগেন মাজেন্দ্রানে। রোস্তমের গদার আঘাতে একে একে শত্রু ভূপাতিত হলো। রাজা কায়কাউস মৃত্যু হলেন।

কিন্তু ভয়ংকর লোমশ প্রাণী সফেদ দেও—এর রক্ত না হলে অশ্ব রাজার চক্ষু ভালো হবে না। মহাবীর রোস্তমের সঙ্গে মহাবলী সফেদ দেও সম্মুখযুদ্ধ শুরু করল। মনে হয় এমন প্রলয়ংকর যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি এবং

তবিষ্যতেও ঘটবে না। দুই বীর যোদ্ধাই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হলেন। অবশেষে মহাবীর রোস্তমের আঘাতে সফেদ দেও-এর কোমর ভেঙে গেল। রোস্তম তলোয়ার দিয়ে সফেদ দেও-এর গলা দ্বিখণ্ডিত করলেন।

অম্ব রাজা কায়কাউস দেও-এর রক্তের ফোটা পেয়ে দৃষ্টি ফিরে পেলেন। আবার ইরানে শান্তি ফিরে এল। রোস্তম ফিরে গেলেন জাবুলিস্তানে।

মহাবীর রোস্তম একবার প্রিয় ঘোড়া রখ্শের পিঠে চড়ে বেরিয়েছেন শিকার করতে। ঘূরতে ঘূরতে তিনি এসে পড়েছেন তুরানের কাছে এক জঙ্গলে। সারাদিন ঘূরে ঘূরে মনিব এবং অশ্ব দুজনই ক্লান্ত। বড় গাছের নিচে রোস্তম শুয়ে পড়েছেন। প্রগাঢ় ঘুমে তিনি নিমগ্ন। পাশেই প্রিয় রখ্শ ঘাস খাচ্ছে।

তখন নিশ্চুতি রাত। রখ্শ আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। সে সময় একদল তুরানি সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়া চুরি করাই তাদের ব্যবসা। রখ্শকে দেখে ওরা লোভ সামলাতে পারল না। ভুলিয়ে ভালিয়ে সে রাতেই ওরা রখ্শকে নিয়ে তুরান পালিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াচোররা জানতেও পারল না তারা কার প্রিয় ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করছে।

সকালের সূর্যের স্থিতি আলোয় এবং অরণ্যে পাথির কূজন শুনে মহাবীর রোস্তমের ঘূম ভাঙ্গল। তিনি অভ্যাস মতোই প্রিয় রখ্শের নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমন তো কখনো হয়নি! রোস্তম এখানে সেখানে খুঁজলেন, অবশেষে বনের প্রান্তে ধূলোর মধ্যে রখ্শের খুরের দাগ দেখে ঠিকই বুঝলেন তুরানি ঘোড়াচোররা তার প্রিয় রখ্শকে নিয়ে পালিয়েছে।

খুরের দাগ অনুসরণ করে ক্রোধে উন্নত মহাবীর রোস্তম সামেনগান শহরে উপস্থিত হলেন। মহাবীর রোস্তমকে চেনে না কে? যারা কোনোদিন চোখে দেখেনি তারাও এই বিশালদেহী মহাবীরকে দেখেই বুঝতে পারল ইনিই ইরানের বীর রোস্তম। বীরের ক্রোধবহু মিশ্রিত চক্ষু দেখে সকলে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। সামেনগান অধিপতির নিকট সৎবাদ গেল, তিনি দ্রুত ছুটে এলেন মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। ইতোমধ্যে সামেনগান অধিপতি তাঁর নগরকে ধ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষার জন্য চতুর্দিকে লোক-লস্কর ছুটিয়ে দিয়েছেন ঘোড়াচোরদের গ্রেফতার করার জন্য।

সামেনগান অধিপতির বিনীত বাক্যে আপাতত তুষ্ট হয়ে রোস্তম এলেন প্রাসাদে রাজত্বিতি হয়ে। রোস্তমের সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন হলো। নৈশভোজ শেষ করে পরিতুষ্ট রোস্তম গোলেন রাজশয়্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে।

হাতির দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে রোস্তমের চোখে তন্দ্রার ভাব এসেছে, তখন মনে হলো এক অপরূপ সুন্দরী তাঁর শয্যাপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরীর স্থিতি সরল বৃপ্মাধুর্য দেখে রোস্তম বিমোহিত হলেন। রোস্তমের তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে দেখলেন স্বপ্নে আর বাস্তবে কোনো তেদ নেই, সত্যিই এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা তাঁর শিয়রের প্রান্তে দণ্ডায়মান। রোস্তম বললেন, কে তুমি রমণী? রমণী সলজ্জ নেত্র তুলে বলল, আমি তহমিনা। সামেনগান অধিপতি আমার পিতা। আপনার বীরত্ব ও শৌর্যের কথা শুনে এতদিন আপনাকে নিয়ে স্বপ্নের মধুর জাল বুনেছি। আপনার বীরত্বে আমি এতকাল অর্ধ্য নিবেদন করেছি। সত্যিই যখন আজ আপনি আমাদের মহান অতিথি হয়ে এসেছেন, তখন জানাতে এসেছি আমি এতকাল আপনাকেই স্বামীত্বে বরণ করেছি।

এই কথা বলে হাওয়ার দোলায় ভেসে তহমিনা ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু ঘরের বাতাসে রেখে গেল তার মধ্যের দোলা এবং মহাবীর রোস্তমের অঙ্গে রেখে গেল এক অনাস্বাদিত মধুর বাংকার।

মহাবীর রোস্তম আর ঘুমাতে পারলেন না। সকালের প্রথম আলো জানালা দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই রোস্তম ছুটে গেলেন সামেনগান অধিপতির কাছে। রোস্তম নিঃসঙ্গেকাচে প্রস্তাব করলেন, তিনি তহমিনাকে বিবাহ করবেন। সামেনগান অধিপতি যেন হাতে আকাশের টাঁদ পেলেন। মহাবীর রোস্তম হবে তার জামাতা, এ যে ধারণার অতীত। তিনি সানল্দে রাজি হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাসমারোহে বিয়ের আয়োজন করতে ছুটে গেলেন।

মহা উৎসব, বিপুল আয়োজনের মধ্যে জাঁকজমক সহকারে রোস্তমের সঙ্গে তহমিনার বিবাহ হয়ে গেল। রাত্রির টাঁদ বাতায়নে দাঁড়াল। নিশাবসানের পূর্বে মহাবীর রোস্তম প্রিয় স্ত্রীর চিবুক স্পর্শ করে বললেন—যদি আমাদের পুত্রস্তান হয় তা হলে এই তাবিজটি তার হাতে পরিয়ে দিও, আর যদি কন্যাস্তান হয় তাহলে এ তাবিজ তার চুলে বেঁধে দিও। এ তাবিজের ভিতর আমি নিজের নাম স্বাক্ষর করে রেখেছি।

তহমিনা ছলছল চোখে স্বামীর দিকে তাকায়। রোস্তম সেই জলভরা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি বীরের স্ত্রী, কান্না তোমার শোভা পায় না। আমি আজই ইরান ফিরে যাব, শত্রুরা আবার প্রিয় ইরানের স্বাধীনতা হরণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

তহমিনা বিছেদব্যথায় কাতর হয়ে হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মহাবীর রোস্তম বাধা দিয়ে বললেন বীরের প্রকৃত স্থান যুদ্ধের ময়দান, যুদ্ধেই তোমার স্বামীর প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠবে।

প্রিয় অশ্ব রখ্শের পিঠে চড়ে মহাবীর রোস্তম ইরানের পথে চলে গেলেন। ঝরোকার উপর চোখ রেখে হতভাগিনী তহমিনা স্বামীর চলে যাওয়া দেখল। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর মাথার সোনার মুকুট দেখা গেল, তহমিনা অপলক দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর যখন আর কিছুই দেখা গেল না, শুধু অশুধারায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। তখন স্বামীর ফেলে যাওয়া শয্যায় আছড়ে পড়ে ব্যাকুল ভাবে কাঁদল। ইরানের অগ্নিদেবতা কি জানতে পেরেছিল তহমিনা কেঁদে কেঁদে বলেছিল—ওগো আমার ভাগ্যদেবতা, আমাকে তুমি পুত্রস্তানের মা হতে দাও, যেন পুত্রের মুখ দেখে আমি বীর স্বামীকে হারানোর দুঃখ ভুলে থাকতে পারি।

হয়তো তহমিনার করুণ আবেদন সৃষ্টিকর্তা শুনেছিল। যথাসময়ে সুন্দরী তহমিনার কোল আলো করে এক পুত্র স্তান এল। সকলেই মহাখুশি। সামেনগান অধিপতি নাতির নাম রাখলেন সোহরাব। মহাবীর রোস্তমের পুত্র সোহরাব। কিন্তু মা তহমিনার বুক সেদিন ক্ষণকালের জন্য হলেও কেঁপে উঠেছিল। তহমিনা যদিও ছেলের হাতে রোস্তমের দেওয়া তাবিজ পরিয়ে দিলেন কিন্তু রোস্তমের কাছে দুট মারফত সংবাদ পাঠালেন তাদের একটি কন্যাস্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

দূতমুখে কন্যার সংবাদ পেয়ে রোস্তম বিমর্শ হলেন। আশা করেছিলেন তিনি পুত্রের পিতা হবেন।

রোস্তম একরকম জোর করেই তহমিনার কথা ভুলে থাকতে চাইলেন।

মহাবীর রোস্তম ইরানের ভরসা। যুদ্ধক্ষেত্র নিয়েই তাঁর দিনরাত্রি কেটে যায়। এদিকে সোহরাব দিনে দিনে আপন মহিমা ও শৌর্য নিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। যেমন তার বিশাল দুটি বাহু, তেমনি উদার প্রশংসন বক্ষ একবার দেখলে বারবার দেখতে হয়। হবেই না কেন? রোস্তমের পুত্র আর এক অতুলনীয় বীর হয়ে পৃথিবীতে আসছে। জাল যার পিতামহ, শাম যার প্রপিতামহ এবং স্বয়ং রোস্তম যার পিতা, সেই পুত্র সোহরাব কি আবার সামান্য বীর হবে! সেও দুরন্ত অশ্বের কেশের ধরে টান মারে, এক থাবায় বাঘের মুখকে ছুরমার করে। তলোয়ার, বর্ণা ও গদাযুদ্ধে সোহরাব সামেনগানের বীর বলে পরিচিত হলো।

একদিন কিশোর সোহরাব এসে মাকে বলল, মা আমার সমবয়সীরা সকলেই বাবার কথা বলে। আমি বাবার কথা কিছুই বলতে পারি না। তাহলে কি আমার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন?

তহমিনা ছেলেকে সাম্ভুনা দিয়ে বলল—না সোহরাব, তোমার বাবা জীবিত আছেন। তিনি ইরানের মহাবীর রোস্তম। এই দেখো তোমার বাজুতে বাঁধা রয়েছে তোমার বাবার দেওয়া তাবিজ। এই তাবিজে তাঁর নাম লেখা আছে।

সোহরাব বাবার কথা শুনে, বাবার বীরত্বের মহিমা জানতে পেরে মাকে বলল— মা, আমি বাবার কাছে যাব বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলব, পিতা, আমি তোমার স্নেহের পুত্র সোহরাব।

মা তহমিনা ছেলের মুখে আদরের চুম্বন দিয়ে বলল, তুই চলে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব। সোহরাব, তোকে কাছে পেলে তোর বাবা কোনোদিন তোকে আমার কাছে ফেরত পাঠাবে না।

তহমিনার অশুসজল চোখ দুটি মুছিয়ে স্নেহময় কর্তে সোহরাব বলল, কিন্তু বাবাকে না দেখলে আমার জীবন যে অপূর্ণ থেকে যাবে মা।

ইরানে আর তুরানে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাজা কায়কাউসের উচ্চাকাঞ্চকার জন্য ইরানের চিরশত্রু আবার তাদের পরাজয়ের শোধ নেওয়ার জন্য সাজ সাজ রব তুলেছে। মাজেন্দ্রান জয়ের পর পার্শ্ববর্তী সব দেশই ইরানের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কেবল হামাউনের রাজা অধীনতা স্বীকার করলেন না।

রাজা কায়কাউস হামাউন আক্রমণ করলেন। হামাউনের রাজা মাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে এক পাহাড়ি কেল্লায় পলায়ন করলেন। হামাউনের রূপসী কন্যা রূদ্বিবার রূপে মুক্ত হয়ে রাজা কায়কাউস তাকে বিবাহ করলেন।

কিন্তু হামাউন মনে মনে এ বিবাহ স্বীকার না করলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। রাজা হামাউন সুযোগ বুঝে কন্যা ও জামাতাকে পাহাড়ি দুর্গে আমত্রণ জানাল। রাজা কায়কাউস শশুরের আমত্রণ পেয়ে সরল মনেই পাহাড়ি কেল্লায় গেলেন। তাঁর আদর আপ্যায়ন কম হলো না। কিন্তু কায়কাউস বুবাতে পারলেন তিনি শশুরের দুর্গে বন্দি হয়েছেন। এ খবর বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল। ইরানের শত্রুরা এবার কঠিন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো। সবার আগে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটে এল তুরানের সেনাপতি আফরাসিয়াব।

সামেনগান তুরান রাঙ্গেরই একটি নগর। সামেনগানের বীর সোহরাবও এ যুদ্ধে একজন সেনাপতি হয়ে তুরানের পক্ষে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল।

মা তহমিনার বুক আর একবার কেঁপে উঠল। সে ছুটে এসে সোহরাবের পথ রোধ করে বলল, সোহরাব তুই এ যুদ্ধে যাসনে। এ ভয়ংকর যুদ্ধ, না জানি কী এক দুঃসহ ঘটনা ঘটাবে।

সোহরাব মাকে বলল, আমি তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি নে মা, আমি যাচ্ছি বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাবার সঙ্গে দেখা করে আমি নিজে তাঁর মাথায় ইরান-তুরানের মিলিত মুকুট পরিয়ে দেব।

দ্রুতগতির অশ্বে চড়ে কিশোর সোহরাব বাবার সঙ্গে প্রথম দেখা করার জন্য ছুটে চলে গেল। তহমিনা সেদিনের মতো আজও বরোকায় চোখ রেখে ছেলের যাওয়া দেখল। যতক্ষণ ঐ লাল ঘোড়াটি দেখা যাচ্ছিল, ঘোড়ার পিঠে স্নেহের সোহরাবকে দেখল মা। তারপর অশুতে ঝাপসা হলো তার চোখ। তহমিনা শয়্যায় পড়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। আজও কি দেবতারা তার কান্না শুনতে পেল? তহমিনা কেঁদে কেঁদে দেবতার উদ্দেশে বলল— আমার সোহরাবকে অঙ্গালের হাত থেকে রক্ষা করো, হে অগ্নিদেবতা।

তুরান যখন ইরান আক্রমণ করে তখন মহাবীর রোস্তম ছিলেন জাবুলিস্তানে। রাজা কায়কাউস দৃত মারফত মহাবীরকে অনুরোধ করে পাঠালেন ইরানের এ দুর্দিনে ছুটে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে।

যুদ্ধের দামামা শুনে প্রকৃত বীর কি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে? যুদ্ধের আহ্বান শুনে প্রিয় রখশ ছুটিয়ে মহাবীর রোস্তম এলেন ইরানে। ইরানের তরসা রোস্তম এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

ইরান ও তুরান দুই প্রতিপক্ষ বাহিনীর যুদ্ধশিবির পড়েছে একই মাঠের দুই দিকে। তুরানি শিবিরের দিকে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কিশোর সোহরাব দেখছে ইরানের শিবির আর ভাবছে কোন ছাউনির মধ্যে তার বীর পিতা রয়েছেন। কেমন করে নির্জনে নিরালায় পিতার সঙ্গে তার দেখা হবে।

সোহরাব মনে মনে এক বুদ্ধি ঠিক করল। সে দ্বন্দ্যযুদ্ধে নির্জনে তার পিতার সঙ্গে মিলিত হবে।

তুরানের দুত গেল ইরানের শিবিরে। তুরানের বীর কিশোর সোহরাব দ্বন্দ্যযুদ্ধ আহ্বান করেছেন প্রবীণ রোস্তমের বিরুদ্ধে। দূতের মুখে এ আহ্বান শুনে রোস্তম মৃদু হাসলেন। বালকের সাহস তো কম নয়। কে এই দুর্দম বালক? রোস্তম নিজের পরিচয় গোপন রেখে এ আহ্বানে সাড়া দিলেন নিতান্তই কৌতুহল বশে।

দুই শিবির থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন রোস্তম আর সোহরাব। নির্জন গিরিপথে পিতা-পুত্রের দেখা হলো। পুত্র দেখল পিতাকে আর পিতা দেখল পুত্রকে। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। রোস্তম বালক সোহরাবকে বললেন, ওহে বালক, তোমার মায়ের চিত্তে কি ভয় নেই? কোন সাহসে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছেন? জীবনের মায়া থাকে তো এখনই পলায়ন করো।

সোহরাবের বলল, আপনি কি সেই মহাবীর রোস্তম? বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রোস্তম লজ্জা পেল বলল, না। রোস্তম এখন জাবুলিস্তানে। আমি রোস্তমের একজন ভূত্য মাত্র।

সোহরাবের মন হতাশায় আচ্ছন্ন হলো। তবু যুদ্ধ শুরু হলো। বর্ণা ভাঙ্গল, তলোয়ার খানখান হলো। দুই বীরের শরীর রক্তান্ত হলো। দিবসের শেষ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ল। সোহরাবের গদার আঘাতে রোস্তম কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছেন। সেদিনের মতো যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে সোহরাব বলল, আজ সম্বি করলাম, কাল আমাদের হারাজিতের পরীক্ষা হবে।

দুই বীর তীব্রতে ক্ষিরে পেলেন। গ্রাম্য ভাবেন, কে এই বালক? তার বাহুতে এত শক্তি কোথা থেকে এল? আর সোহরাব ভাবে, কীজন্য এলাম যুদ্ধ করতে, যদি আমার বাবা জাবুলিম্বানেই থেকে পেল?

পরের দিন আবার সেই নির্জন স্থানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সোহরাব পুনরাবৃত্তি করল, অনুভব করে বন্ধু আপনি কি সত্যি মহাবীর গ্রাম্য নন? যদি গ্রাম্য হন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

গ্রাম্য তখন ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গ করে সোহরাবকে উভেজিত করছেন: তবে মূর্খিকথবর, গ্রাম্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা দুশ্পেষ্য বালকের কাজ নয়। আগে আমাকে প্রাণিত করো, তবেই গ্রাম্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার আশৰ্বা করো।

সোহরাব এবার উভেজনায় কাঁপতে কাঁপতে গ্রাম্যকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল। গ্রাম্য সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে পেলেন। সোহরাব তাঁর বুকের উপর বসে অস্ত্রের আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। গ্রাম্য ক্ষোশল করে বললেন, এ তোমার কোন বীরত্বের রীতি? শত্রুকে পরপর দুবার প্রাণিত না করলে তাকে প্রাণে বধ করা যায় না। ইরানের এই যুদ্ধবীজিকে দূরি অস্তীকার করতে চাও?

সোহরাব গ্রাম্যকে ছেড়ে দিল। সেদিনের মতো সন্ধি, আবার আগামীকাল যুদ্ধ।

তৃতীয় দিন আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সোহরাব দেখে গ্রাম্যকে। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার সে দেখে গ্রাম্যের দিকে। গ্রাম্যের আজ সেদিকে ভুক্ষেপ নেই। তিনি সামান্য এক বালকের হাতে প্রাজরের প্লানি বহন করতে রাজি নন।



গ্রাম্য প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। কিন্তু আনন্দনা সোহরাবকে আজ গ্রাম্য ধরাশায়ী করে ফেললেন।
সোহরাবকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই প্রথম সুযোগে গ্রাম্য ভীক্ষ্ণবীর তলোয়ার বের করে সোহরাবের বুকে

তুকিয়ে দিলেন। সোহরাবের তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কোথায় গেল ইরানের যুদ্ধের নিয়ম, কোথায় গেল মহাবীর রোস্তমের বীরত্ব। সোহরাব যন্ত্রণায় এবং ক্ষেত্রে ক্রম্মন করে বলল, শোনো ইরানি কাপুরুষ। তুমি অন্যায় যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ে আমাকে প্রাণে বধ করলে। কিন্তু এ সংবাদ যখন আমার বাবা জানতে পারবেন তখন তুমি সাগরের অতলেই থাকো কিংবা আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে পলায়ন করো, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

রোস্তম বললেন, কে তোমার বাবা?

সোহরাবের বুক থেকে তখন রক্তের স্তোত গড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্ত অবসন্ন সোহরাব বলল, মহাবীর রোস্তম আমার বাবা, আর সামেনগানের অধিপতির কন্যা তহমিনা আমার মা।

সহস্র বজ্রপাতের মতো মহাবীর রোস্তমের কানে সোহরাবের শেষ কথাগুলো শেলবিন্ধ হলো। রোস্তম আর্তনাদ করে বললেন, মিথ্যা কথা, ওরে বালক মিথ্যা কথা! আমার কোনো পুত্রসন্তান নেই। তহমিনা আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আমার কন্যাসন্তান হয়েছে।

সোহরাব শেষবারের মতো চক্ষু মেলে বাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে তার হাত তুলে দেখাল, সেখানে একটি তাবিজ বাঁধা আছে। সোহরাব বলল, বাবা আমার আর কোনো দুঃখ নেই। সোহরাবের চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

সোহরাবের নিষ্পত্তি দেহ পিতার বক্ষে আশ্রয় লাভ করল।

তখন নির্জন গিরিপথে কোনো প্রাণী ছিল না, আকাশের সূর্য এসে সোহরাবের মুখে পড়েনি, কোনো বিদায় রাগিণী বেজে উঠে সেই বিদায় দৃশ্যকে বিহুল করেনি। তবু রোস্তমের বুকফাটা হাহাকার, ফিরে আয় মানিক। প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে এসে বারবার বলছিল, নেই সোহরাব নেই।

দিবসের শেষ সূর্য যখন পর্বতের ওপারে ঢলে পড়ল, তখনো হতভাগ্য মহাবীর রোস্তম ছেলের প্রাণহীন দেহ বক্ষে ধারণ করে বারবার বলছেন – আয় সোহরাব, ফিরে আয়।

সার-সংক্ষেপ

মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য ‘শাহনামা’ এর উল্লেখযোগ্য সোহরাব রোস্তম গল্পের সংক্ষিপ্ত ক্লপ। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার এক পিতা ও পুত্রের হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে।

ইরানের বীর শাম এর পুত্র জাল ছিলেন বলিষ্ঠ দেহী এবং বীরযোদ্ধা। ক্রমেই তিনি বাদশাহের সুন্দরীর আসেন এবং রাজকন্যা রূদাবার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সন্তান জন্মের পূর্বে রূদাবা ভবিষ্যৎদ্রুষ্টা সী মোরগের ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন। এ অনুযায়ী জালের ঘরে যে সন্তান আসবে সে পৃথিবীতে খ্যাত হবে তার বীরত্ব ও সাহসের গুণে। তাদের কোলে জন্ম নেয়া এই সন্তানই রোস্তম।

শৈশব থেকেই রোস্তমের বীরত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তরুণ বয়সেই একক বীরত্বে রোস্তম জয় করেন অজেয় সোপান্দি দুর্গ। ইরানের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে বীর রোস্তম হয়ে উঠেন ইরানের মহাবীর রোস্তম। ঘটনাক্রমে সামেনগান অধিপতির কন্যা তহমিনার সাথে বিয়ে হয় তার। বিয়ের পরপরই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। বিদায় বেলায় স্ত্রীকে একটি তাবিজ দিয়ে বলেন যেন পুত্র সন্তান হলে তার হাতে বেঁধে দেন। যথাসময়ে তহমিনার কোল জুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। মা তার নাম রাখেন সোহরাব। কিন্তু স্বামীর কাছে ছেলে হারানোর ভয়ে তা গোপন রেখে কন্যা সন্তান হওয়ার মিথ্যা খবর পাঠন রোস্তমকে। শৌর্য-বীর্যে বাবার মতোই শক্তিশালী বীর হয়ে উঠে সোহরাব এবং বাবার সাথে দেখা করার জন্য তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে। ঠিক এসময় ইরান ও তুরানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। বাবার সাথে দেখা করার আশায় সোহরাব তুরানের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। ক্রমেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে

সোহরাবের বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। সোহরাব দন্দযুদ্ধের আহ্বান করেন মহাবীর রোন্তমকে। কিন্তু কৌশলে নিজের পরিচয় গোপন রেখে দন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হন রোন্তম। দুজনের তুমুল লড়াইয়ে সোহরাব ধরাশায়ী করেন রোন্তমকে। যুদ্ধের নিয়মের কথা বলে সে যাত্রায় রক্ষা পান রোন্তম। কিন্তু রোন্তম যখন সোহরাবকে ধরাশায়ী করেন তখন যুদ্ধের নিয়মের তোয়াক্ষা না করে তার তলোয়ার দুকিয়ে দেন সোহরাবের বুকে। মৃত্যুপথযাত্রী সোহরাব ছদ্মবেশী রোন্তমকে খুলে বলে তার পরিচয়। সোহরাব যুদ্ধের নিয়ম অনুসরণ করলেও রোন্তম তা করেন নি। পিতার হাতেই পুত্র নিহত হলো।

এভাবেই সোহরাব-রোন্তমের কাহিনী বিয়োগান্তক পরিষ্ঠিতি লাভ করে।

শব্দার্থ

- আশঙ্কা - ভয়।
- শৌর্য - বীরত্ব।
- হেষাধ্বনি - ঘোড়ার ডাক।
- বিভ্রান্ত - ভুল পথে যাওয়া।
- বন্দিদশা - বন্দি অবস্থা।
- ভূপাতিত - মাটির উপর পড়া।
- লোমশ - লোমে ভরা, লোমবহুল।
- ক্রোধবহু - রাগের আগুন, রাগান্বিত।
- নৈশভোজ - রাতের খাবার।
- তন্দ্রা - ঘুম।
- সলঙ্গ - লঙ্ঘামিশ্রিত।
- অপলক - পলকহীন, চোখের পাতা পড়ে না এমন।
- ক্ষান্ত - সমাপ্ত।
- মৃষিক - ইঁদুর।
- দুখপোষ্য - দুখ খাইয়ে পালন করতে হয় যাকে।
- গ্লানি - কলঙ্ঘজনক বা অবমাননা।
- নিস্পন্দ - স্থির।
- বিলাপ - ভ্রসন, শোকপ্রকাশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সাদা রঙের চুলওয়ালা ছেলে অভিশাপ ডেকে আনতে পারে’- এ বাক্যে সে সময়কার কোন চিত্র প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ক. ধর্মীয় বিশ্বাস | খ. অন্ধ-কুসংস্কার |
| গ. সামাজিক প্রথা | ঘ. রাজদণ্ডের ভয় |

২. সোহরাবের মা তহমিনা তাঁর স্বামীর কাছে মিথ্যা সংবাদ পাঠালেন-

- i. পুত্র হারানোর আশঙ্কায়
- ii. অপত্য মেহের কারণে
- iii. স্বামীকে হারানোর দৃঢ় ভুলতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ঢ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ’ কবিতায় দেখা যায়, মেঘনাদ যখন যজ্ঞরত ছিলেন এবং তাঁর কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না তখন লক্ষ্মণ তাকে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। মেঘনাদ তাঁর চাচা বিভীষণকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কহ, মহারথী, এ কি মহারথী প্রথা?’

৩. উদ্দীপকের লক্ষণের সাথে ‘সোহরাব রোক্তম’ গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. সোহরাব | খ. রোক্তম |
| গ. কায়কাটস | ঘ. আফরাসিয়াব |

৪. উভয়ের চরিত্রে সাদৃশ্য রয়েছে-

- i. কাপুরুষতার দিক থেকে
- ii. অন্যায় যুদ্ধ আহ্বানে
- iii. যুদ্ধের রীতি ভঙ্গ করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছয় মাস বয়সী সন্তান রাসু ও স্ত্রীকে রেখে ফেরার হয় রামিজ আলী। মিথ্যা মামলার আসামী হওয়ায় রাতের অঙ্ককারে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন তিনি। যাওয়ার সময় প্রিয় সন্তানের গলায় তারই লকেটটি পরিয়ে যান। মাঝখানে কেটে যায় সাতাশটি বছর। রামিজ আলী হয়ে উঠে দুর্ধর্ষ এক ডাকাত। একদিন এক ব্যবসায়ী তার কবলে পড়ে। ব্যবসায়ীর ধনসম্পদের জন্য ডাকাত তাকে আঘাত করলে ব্যবসায়ী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তার গলার লকেটটি খুলে যায়। এক পর্যায়ে ডাকাত তার গলার লকেট দেখে বুঝতে পারে ব্যবসায়ী আর কেউ নয়, তারই সন্তান রাসু। সন্তানের পরিচয় পেয়ে সেদিন থেকে ডাকাতি ছেড়ে রামিজ আলী ফিরে আসে স্বাভাবিক জীবনে।
 - ক. রাজা ইরিজির পিতার নাম কী?
 - খ. শাম পুত্র জালকে আলবুরজ পর্বতে ফেলে এসেছিলেন কেন?
 - গ. উদ্দীপকের রাসুর সাথে ‘সোহরাব রোগ্নম’ গল্লের সোহরাবের যে দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উদ্দীপকের রামিজ আলী ‘সোহরাব রোগ্নম’ গল্লের রোগ্ন চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
২. প্রবল বিক্রিমে লড়াই করছেন বাংলার দুই বীর সেনা মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও বার ভুঁইয়ার প্রধান জঙ্গা খা। এক পর্যায়ে ইশা খাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে মানসিংহের তরবারি ভেঙে যায়। যুদ্ধরীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ইশা খা তাঁকে পুনরায় আঘাত বা বন্দি না করে নিজের কাছে থাকা আরেকটি তরবারি মানসিংহকে এগিয়ে দিলেন। মানসিংহ ইশা খাঁর এ আচরণে স্তুতি হলেন। তরবারি না ধরে পরাজয় মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।
 - ক. ‘সোহরাব রোগ্নম’ গল্লটির মূল লেখকের নাম কী?
 - খ. রোগ্নম একরকম জোর করেই তহমিনার কথা ভূলে থাকতে চাইলেন -কেন?
 - গ. উদ্দীপকে ‘সোহরাব রোগ্নম’ গল্লের যে ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উদ্দীপকের ইশা খা ‘সোহরাব রোগ্নম’ গল্লের রোগ্ন চরিত্রের চেয়ে বীর ও মহানুভব-এ মন্তব্যের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

মার্চেন্ট অব ভেনিস

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

ইতালির ভেনিস শহরে ছিল এক সওদাগর। নাম তার অ্যাঞ্টনিও। সদা হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল। বিপদ-আপদে অভাবহস্তরা ছুটে আসে তার কাছে। মুক্তহস্ত অ্যাঞ্টনিও কাউকেই শূন্যহাতে ফেরায় না। চারদিকে তার নামের প্রশংসা।

কিন্তু অ্যাঞ্টনিওর এই যশ প্রতিপত্তির ধাক্কা গিয়ে লাগে আর একটি অঙ্গে। সেও একজন ব্যবসায়ী। তবে সুদের ব্যবসা করে। কাউকে বেকায়দায় পেলে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। ধার পরিশোধের সময় ঝগঝাইতাকে সর্বস্ব খোঘাতে হয়। ভেনিসের মানুষ তাই কেউ তাকে বরদাস্ত করতে পারত না। এই ব্যবসায়ীর নাম শাইলক। জাতে ইতুনি। অ্যাঞ্টনিওকে সংগত কারণেই সে দুচোখে দেখতে পারত না। অপরপক্ষে খ্রিস্টান ধর্মবলন্তী অ্যাঞ্টনিও ঘৃণার চোখে দেখত তাকে। সে বিধৰ্মী বলে নয়। শাইলকের নীতি সম্রক্ষে সে বন্ধুমহলে মাঝে মধ্যে কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করত।

শাইলক সুচতুর ও অত্যন্ত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। সে অ্যাঞ্টনিওর ব্যবসার লাভ-লোকসান আর নিজের সুদের ব্যবসা মূলত একই পর্যায়ে বিবেচনা করত।

তবে অ্যাঞ্টনিওর এই উদারনীতির জন্য শাইলকের সুদের ব্যবসার যে বহু ক্ষতি হচ্ছিল— একথা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সে মনেপ্রাণে অ্যাঞ্টনিওর ধৰহস্ত কামনা করত।

অ্যাঞ্টনিওর বন্ধুর অভাব নেই। বন্ধুমহলের মধ্যে বাসানিও ছিল তার অত্তরঙ্গ। একদিন খ্লান মুখে এসে অ্যাঞ্টনিওকে জানাল, পোর্শিয়া নামের একটি সুন্দরী যুবতীর বিয়ে হচ্ছে, বহু ধনরত্নের মালিক সে। আর তাকে সে পছন্দও করে। কিন্তু টাকাপয়সা না থাকার জন্য সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছে না।

অ্যাঞ্টনিওর বাণিজ্য জাহাজগুলো তখন সাগরবক্ষে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরছে; এখনও সেগুলো বন্দরে ফেরেনি; তাই সে বন্ধুকে তখন অর্থ সাহায্য করতে পারল না। সেজন্য সে বলল, ‘আপেক্ষা করো বন্ধু। বর্তমানে আমার হাতে নগদ কিছু নেই সত্য, তবে তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করছি।’

কিন্তু তাহলে যে সর্বনাশ হবে। বাসানিও মুষড়ে পড়ে, ‘জাহাজ বন্দরে পৌঁছেনি সে তো আমি জানি। কিন্তু টাকাটা যে এখনই দরকার। পোর্শিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার টাকা আমার তো কোনো উপকার করতে পারবে না বন্ধু।

অ্যাঞ্টনিও বলল, ‘তাহলে কোনো স্থান থেকে টাকাটা ধার নাও। আমি না হয় তোমার জামিন থাকব।’

কিন্তু অত টাকা ধার দেবে কে? অনেক ভেবে বাসানিও শাইলকের দারস্থ হলো। বলল, ‘ধনী বণিক অ্যাঞ্টনিও যদি আমার জামিন থাকে তবে কি আপনি আমাকে তিন হাজার ড্যাকাট ধার দিতে প্রস্তুত আছেন? আমি সুদ দিতে প্রস্তুত।’

অ্যাল্টনিওর কথায় সুদখোর শাইলক তামাটে দাঁত বের করে হাসলেন। এই মোক্ষম সুযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাল্টনিওকে ফাঁদে ফেলার আশায় মন তার চক্ষুল হয়ে উঠল। তার বিরুদ্ধে অপস্থিতির আর কৃত্স্না রটানোর প্রতিশোধ গ্রহণের এ সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করার যুক্তি সে খুঁজে পেল না।

একবাক্যে টাকা ধার দিতে সে রাজি হলো। মুখে মধুর বুলি আওড়ে বলল, অ্যাল্টনিও যখন নিজেই জামিন থাকছে তখন আর সুদ গ্রহণের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তবে কিনা একান্ত পরিহাসছলে একটা শর্ত শিখে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে খণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হলে অ্যাল্টনিওর শরীর হতে শাইলককে এক পাউন্ড মাঝস কেটে দিতে হবে।

সুদখোর বুড়ো শাইলকের কথায় বাসানিও চমকে উঠল। কিন্তু অ্যাল্টনিও শুনে বলল, টাকাগুলো খুব দরকার। আর তা ছাড়া বাণিজ্য জাহাজ ফিরে এলে এ অর্থসংকট তো আর থাকছে না। তখন শাইলকের মনে কোনো বদ মতলব থেকে থাকলেও সে ব্যর্থ হবে, সে মাঝস কেন অ্যাল্টনিওর কেশাথও স্পর্শ করতে পারবে না।



পৌর্ণিয়া প্রয়াত বাবার একমাত্র কন্যা। অসংখ্য ধনসম্পদ আর বৃপ্লাবণ্যের জন্য বহু ডিটক ও রাজপুত্রদের নজরে পড়েছে সে। তার পাণিপ্রাণী হয়ে তাই হাজার যুবকের ভিড়। কিন্তু বাবার নির্দেশমতো পৌর্ণিয়া মাত্র তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নিল। তার মধ্যে ভাগ্যবান বাসানিও ছিল।

বিয়ের শর্তানুযায়ী প্রাথমিক বাছাইকৃত যুবক তিনজনকে পৃথক পৃথকভাবে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পাশাপাশি তিনটি পেটিকা ছিল। একটি সোনার আর একটি রূপার এবং সর্বশেষটি সিসার। একটা পেটিকার মধ্যে ছিল পোর্শিয়ার নিজের ছবি। ছবিসহ পেটিকা যে নির্বাচন করতে পারবে সে—ই বিজয়ী হবে এবং পোর্শিয়ার সাথে অগাধ ধনরত্নের উভরাধিকারী হবে। এই ব্যাপারটি বাবার উপদেশ অনুযায়ীই স্থির করেছিল পোর্শিয়া।

প্রথমে মরক্কোর রাজপুত্র ঘরের মধ্যে এলেন। পেটিকা তিনটির মধ্যে স্বর্ণেরটাই তিনি বাছাই করলেন। এর গায়ে কারুকার্যের সাথে খোদাই করা ছিল : যে আমাকে বাছাই করবে সে বহুগুণ বাস্তিত ধন পাবে। কিন্তু খুলে দেখা গেল এতে পোর্শিয়ার ছবি নেই। পরিবর্তে আছে মড়ার মাথার খুলি আর উপদেশবাণী লেখা। একখানা চিরকুট। তাতে লেখা—

চকচক করিলেই সোনা নাহি হয়
বহু লোক এ কথাটি শুনেছে নিশ্চয়,
বহু লোক লোভে করে জীবনের ক্ষয়
শুধু দেখে বাহিরের চাকচিক্যের জয়।

মরক্কোর রাজকুমার মনে অফুরন্ত হতাশা আর হাহাকার নিয়ে বিদায় হলেন। এবার আরাগনের যুবরাজের পালা। তিনি রৌপ্য পেটিকা উভ্রোলন করলেন। এই পেটিকার গায়ে খোদাই করা ছিল : আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার প্রাপ্য পাবে। কিন্তু বাঙ্গাটি খুলে তিনি হতাশ হলেন। দেখলেন পোর্শিয়ার ছবির পরিবর্তে ভিতরে রয়েছে একটা বোকার ছবি আর একখানা চিরকুট। তাতে লেখা—

সাতবার রৌপ্য—পাত্র হয় অগ্নিদন্ত্য
বারবার পোড় খেলে বুদ্ধি পরিশুন্ধ
আমি যথা ঢাকা ছিনু রূপোর মায়ায়
ফিরে যাও ঘরে তুমি, তোমাকে বিদায়।

যুবরাজ লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। এবার বাসানিও। কঙ্গিত চোখে পেটিকা তিনটির গায়ের লেখা পড়লেন। দেখলেন, সিসার কোটার গায়ে লেখা রয়েছে : আমাকে যে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব ঝুঁকি নিতে হবে। অনেক চিন্তা করে এই সাধারণ জৌলুশহীন পেটিকাই নির্বাচন করলেন তিনি। কঙ্গিত হস্তে ঢাকনা খুলতেই যুবতী পোর্শিয়ার হাসিমাখা ছবি পেলেন এবং একখানা চিরকুট, তাতে লেখা—

করোনি বাছাই তারে দেখে চেকনাই
অনুকূল তব ভাগ্য সন্দেহ তো নাই
যবে হলো করায়ন্ত সৌভাগ্য তোমার
এতেই তুষ্ট থেকো, চেয়ো নাকো আর।

পোর্শিয়া তাকে স্বাগত জানাল। উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে পোর্শিয়ার চাকরানি সুন্দরী নেরিসাকে দেখে বাসানিওর চাকর গ্রাসিয়ানো মুঝ হয়ে গেল। পোর্শিয়ার মধ্যস্থতায় তারাও দাঙ্গত্যজীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও একটি মর্মস্তুদ দুর্ঘটনার খবর বয়ে আনল একখানা চিঠি। চিঠিখানা অ্যাস্টনিও লিখেছে, তার সবগুলো জাহাজ ঝড়ে সাগরবক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। শাইলক টাকার জন্য আদালতে নালিশ করেছে। চিঠি বহনকারী সালারিও আরও জানাল, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইতুদি শয়তানটা টাকা নিতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে। কারণ দলিলের শর্ত মোতাবেক খণ্ড পরিশোধের সময়সীমা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে অ্যাস্টনিওর গায়ের এক পাউন্ড মাংস চায়।

এর মধ্যে আরও এক ব্যাপার ঘটে গেছে। শাইলকের একমাত্র মেয়ে জেসিকা ফ্রিস্টান যুবক লরেঞ্জের কুম্ভগায় পড়ে পালিয়ে গেছে। লরেঞ্জে অ্যাস্টনিওর কম্পুপুত্র। তাই গোটা ফ্রিস্টান জাতির উপর শাইলক এখন বীতশুম্ব। এখন আইনে যখন আটকানো গেছে তখন অ্যাস্টনিওকে ক্ষমার আর কোনো প্রশ্নই উঠে না।

খবরটিতে পোর্শিয়া হায় হায় করে উঠল এবং স্বামীই যে এসবের মূল-তাও জানতে পারল। দশগুণ অর্থ দিয়ে বাসানিওকে তাড়াতাড়ি ভেনিসের আদালতে পাঠাল সে। সেখানে বিচার হবে মহামতি অ্যাস্টনিওর।

স্বামীকে পাঠিয়ে বুদ্ধিমতী পোর্শিয়াও বসে থাকল না। পরিচারিকা নেরিসাকে সঙ্গে করে পুরুষের ছদ্মবেশে সেও ভেনিসের উদ্দেশে যাত্রা করল।

আদালতে তখন বিচার শুরু হয়ে গেছে। বিচারক অ্যাস্টনিওকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কোনো উকিল আছে? অ্যাস্টনিও সংক্ষেপে জবাব দিল, না ধর্মাবতার, আমার কোনো উকিলের আবশ্যকতা নেই।

অবশেষে বিচারক দীর্ঘস্থাস ছেড়ে বললেন, আপনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনাকে এমন একজন পায়াগ হৃদয় মানুষ নামধারী জঘন্যতম জীবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, যার মধ্যে মানবিক কর্মান্বাস সামান্যতম ছিটকেটাও নেই। তারপর শাইলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে অবশ্য তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

শাইলক ক্রুদ্ধস্বরে বলল, ‘ধর্মাবতার, এখানে ক্ষমার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমি তো চুক্তিনামার বাস্তবায়ন চাচ্ছি মাত্র। আপনি যদি আমার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে বুরুব আইনের অগ্রমৃত্যু ঘটেছে।’

বিচারক আর কোনো কথা বললেন না। অ্যাস্টনিও বলল, ‘ধর্মাবতার, আপনি আর আমার জন্য অপদস্থ হবেন না। আমি প্রস্তুত।’

খুশিতে শাইলকের চোখ চকচক করে উঠল। তার প্রাপ্য এক পাউন্ড মাংস পাবার জন্য সে জুতোর তলায় ছুরি শান দিতে লাগল।

ঠিক এমন সময় এক পেয়াদা একখানা চিঠি এনে বিচারকের কাছে দিল। তাতে লেখা অ্যাস্টনিওর এক কম্পু একজন উকিল পাঠিয়েছেন। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন; অ্যাস্টনিওর পক্ষে কথা বলতে চান তিনি।

বিচারকের অনুমতি পেয়ে এক তরুণ উকিল আদালতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু উকিল সব শুনে মাংস কেটে

নেবার পক্ষেই সমর্থন দিলেন। শুনে বাসানিও স্থান কাল পাত্র ভুলে আদালতের মধ্যেই কাঁদতে শুরু করল। তার জন্যেই তো আজ তার অকৃত্রিম বন্ধু অ্যাস্টনিওর এই অবস্থা।

উকিল বললেন, মানবতার খাতিরে আইনকে বিসর্জন দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের আইনের প্রতি শুন্ধাশীল থাকা আবশ্যক। এবার আপনি মাংস কেটে নিন। আর অ্যাস্টনিও, আপনিও শর্ত পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

অ্যাস্টনিও আস্টেট বললেন, আমি প্রস্তুত আছি।

শাইলক মহাখুশি। তরুণ উকিলের আইনের প্রতি বিচক্ষণতা, আনুগত্য ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করে ছুরি উঁচু করে অ্যাস্টনিওর দিকে সে এগিয়ে গেল। তরুণ উকিল বলল, অবশ্যই, আপনাকে ধন্যবাদ শাইলক। আপনিও আইনের প্রতি যথেষ্ট শুন্ধাশীল জেনে সুখি হলাম। কারণ দশগুণ টাকা অ্যাস্টনিও পরিশোধ করতে চাইলেও আপনি তা গ্রহণ করেননি।

‘আপনি ঠিকই বলেছেন উকিল সাহেব।’ দেঁতো হাসি হাসতে লাগল শাইলক।

অ্যাস্টনিওর পক্ষের উকিল বললেন, শর্তানুযায়ী আপনি এক পাউন্ড মাংস পাবেন—অবশ্যই সেটা পাবেন, কিন্তু দেখবেন যেন মাংস কেটে নেবার সময় তার কম বা বেশি না হয়। দ্বিতীয়ত সঙ্গে একবিন্দু রক্তও যেন না বারে। কারণ রক্তের কথা দলিলে লেখা নেই।

বজ্জ্বাহত পথিকের মতো দাঁড়িয়ে রইল শাইলক। এ তো সাংঘাতিক পঁয়াচ, রক্ত না ঝরলে মাংস নেবে কী করে। আর এক পাউন্ড মাংস মেপে কাটা কী সম্ভব?

শাইলক থরথর করে কাঁপছে আর তরুণ উকিলের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। উপায়ন্তর না দেখে শাইলক তাড়াতাড়ি বলল, আমি মাংস চাই না, আমার আসল টাকাটা চাই।

বিচারক এবার কথা বললেন, অসম্ভব। আপনার বিবুদ্ধে এবার চার্জ হবে। একজন নাগরিককে হত্যার উদ্দেশ্যে আপনি বন্দপরিকর ছিলেন। এর শাস্তিব্রূপ আপনার অর্ধেক সম্পত্তি অ্যাস্টনিও পাবে, বাকি অর্ধেক সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

অ্যাস্টনিও চমকে উঠল। বলল, না, ওর একটা কানাকড়িও আমি চাই না। আমার বন্ধুপুত্র লরেঞ্জে ওর মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ও যদি স্বীকৃতি দেয় তবে তাদেরকে আমার অংশ আমি দান করে দিলাম।

অগত্যা শাইলক তাতেই রাজি হলো।

বিচারকার্য শেষ হলো। অ্যাস্টনিও তরুণ উকিলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। পারিশ্রমিকের কথা উঠলে তিনি বললেন কোনো পারিশ্রমিক তিনি নেবেন না, তবে যদি একান্তই তিনি দিতে চান তবে তার বন্ধু বাসানিওর আঠটাটা উপহারব্রূপ দিতে পারেন।

আঠটাটা আর এমন কী মূল্যবান! তবু বাসানিও তা দিতে ইতস্তত করছিল। কারণ আঠটাটা ছিল নববধূ ১৫

পোর্শিয়ার তরফের উপহার এবং এটা হস্তান্তর নিষিদ্ধ ছিল। তবু বন্ধুর ব্যাপারে সে কী না দিতে পারে।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। বাসানিও ফিরে এলেন বেলমেন্ট শহরে পোর্শিয়ার কাছে। বাসানিওর হাতে আঢ়টি না দেখে বিমিত হয়ে বাসানিওকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হাতে আমার দেওয়া উপহারটা কই?

বাসানিও সব খুলে বলল। তারপর হাসিমুখে পোর্শিয়া একটা আঢ়টি এনে তার হাতে পরিয়ে দিল। কিন্তু আঢ়টিটা দেখে চমকাবার পালা ছিল বাসানিওর। কারণ এ সেই আঢ়টি যেটা সে তরুণ উকিলকে উপহার দিয়ে এসেছিল। সে জানতে চাইল, ‘তুমি এটা কোথায় পেলে?’

তখন একটা উচ্চহাসির রোল পড়ে গেল।

সার-সংক্ষেপ

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের চিরায়ত নাটকগুলোর অন্যতম বিখ্যাত একটি নাটক ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’। নাটকটিকে অতি সংক্ষেপে রূপান্তর করা এই গল্পটিতে সৎ ও অসৎ ব্যক্তির পরিণাম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইতালির ভেনিস শহরের সওদাগর অ্যান্টোনিও একজন সৎ, বন্ধুবংশল ও ভালো মানুষ হিসেবে সকলের কাছে প্রশংসিত। এই শহরের আর এক সওদাগর শাইলক। উচ্চহাসির সুদে টাকা খাটানো তার প্রধান ব্যবসা। টাকা ধার দেওয়ার সময় এমন সব শর্ত জুড়ে দেয় যাতে খণ্ডহীতা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়। শহরের কেউ তাকে পছন্দ করে না। সে মনে মনে অ্যান্টোনিওর ধর্স কামনা করে। অ্যান্টোনিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যাসানিও। টাকা-পয়সার অভাবে ধনীর দুলালী কন্যা পোর্শিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছে না ব্যাসানিও। বন্ধুর ব্যথায় কাতর অ্যান্টোনিও ব্যাসানিওকে শাইলকের কাছে যে কোনো শর্তে টাকা ধার নিতে বলেন। ব্যাসানিও টাকা ধার নেয় এবং যথাসময়ে পোর্শিয়াকে বিয়ে করে।

এদিকে ধার নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার সময় পার হয়ে যাওয়ায় দুষ্টু শাইলক এক ফন্দি আটে। সে টাকার বদলে অ্যান্টোনিওর বুকের এক পাউন্ড মাংস চায় যা টাকা ধার নেওয়ার সময় শর্ত ছিল। স্বামীর উপকারী বন্ধুর এমন বিপদের কথা পোর্শিয়াকে বিচলিত করে। আদালতে যখন বিচারকার্য চলছে তখন এক তরুণ আইনজীবীর ছদ্মবেশে পোর্শিয়া যুক্তি তর্কে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। এতে অ্যান্টোনিও মুক্তি পায় এবং শাইলককে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

গল্পটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সৎ উদ্দেশ্য চিরদিনই সফল হয় আর অসৎ উদ্দেশ্যের পরিণতি কখনো ভালো হয় না।

শব্দার্থ

মার্চেন্ট অব ভেনিস (THE MERCHANT OF VENICE) – ভেনিস শহরের বণিক বা সওদাগর।

প্রতিপক্ষি	-	ক্ষমতা, শক্তি।
সর্বম	-	যা কিছু আছে সমস্তই।
বরদাস্ত	-	সহ্য।
সুদখোর	-	টাকা ধার দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী।
মোক্ষম	-	প্রবল, সাংঘাতিক।
কৃৎসা	-	নিষ্ঠা।
মতঙ্গব	-	ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।
কেশাঘ	-	চুলের ডগা (অগ্রভাগ)।

ପ୍ରସ୍ତାତ	-	ଗତ ।
ଡ୍ୟାକାଟ	-	ଇତାଲীଆ ମୁଦ୍ରା ।
ପାଣିଥାର୍ଥୀ	-	ବିଯେ କରତେ ଇଚ୍ଛୁକ ।
ଚାକଚିକ୍ୟ	-	ଓଞ୍ଜଙ୍ଗଳ୍ୟ, ଦୀପିତ ।
ସୀତପ୍ରମ୍ପ	-	ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ, ଆସ୍ଥାହୀନ ।
ଅପଦସ୍ଥ	-	ଲାକ୍ଷ୍ମିତ, ଅସମ୍ଭାନିତ ।
ଆନୁଗତ୍ୟ	-	ବଶ୍ୟତା, ଅଧୀନତା ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ

୧. “ମାର୍ଚେନ୍ଟ ଅବ ଭେନିସ” ଏର ଅର୍ଥ ଭେନିସେର-

କ. ରାଜପୁତ୍ର	ଘ. ସେଂଦାଗର
ଗ. ପ୍ରେମିକ	ଘ. ନାବିକ
୨. ଶାଇଲକ ସ୍ବଭାବେ କେମନ ଛିଲ?

କ. ସଭ୍ୟତାବିରୋଧୀ	ଘ. ବର୍ଣ୍ଣବିଦେଶୀ
ଗ. ମାନବବିଦେଶୀ	ଘ. ଜାତିବିଦେଶୀ
୩. ଅୟାନ୍ଟନିଓ-ଏର ପକ୍ଷେର ଛନ୍ଦବେଶୀ ତର୍କଣ ଉକିଲ କେ ଛିଲେନ?

କ. ପୋର୍ଶିଆ	ଘ. ଲରେଞ୍ଜୋ
ଗ. ମ୍ୟାଲାରିଓ	ଘ. ନେରିସା
୪. ପୋର୍ଶିଆର ଛନ୍ଦବେଶ ଧାରଣେର ମାଧ୍ୟମେ ତାର ଚରିତ୍ରେର କୋନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ?

କ. କୃତଜ୍ଞତାବୋଧ	ଘ. ଆନୁଗତ୍ୟ
ଗ. ବିଚନ୍ଦନତା	ଘ. ସହନଶୀଳତା
୫. ‘ମାର୍ଚେନ୍ଟ ଅବ ଭେନିସ’ ଗଲ୍ଲେର ମୂଳ ବିଷୟ କୋନଟି?

କ. ବସ୍ତୁତ୍ସ୍ଵ ଛାପନେର ନାନାବିଧ କଲା-କୌଶଳ	ଘ. ବୁଦ୍ଧି କାଜେ ଲାଗିଯେ ସ୍ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ସାଧନ
ଗ. ସୁକର୍ମ ଓ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ ଗାଁଓଯା	ଘ. କୃତଜ୍ଞଚିନ୍ତି ଓ ପରୋପକାରୀ ମାନୁଷେର ପରାଜୟ
୬. ଶାଇଲକକେ ଏକ କଥାଯ କି ବଲା ଯାଯ?

କ. ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ	ଘ. ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଗ. କୁଚଞ୍ଚି	ଘ. ଦାନଶୀଳ

৭. বাসানিওকে টাকা ধার দেওয়ার পিছনে শাইলকের মূল উদ্দেশ্য—
- অ্যান্টনিওকে হেয় প্রতিপন্ন করা
 - অ্যান্টনিও এবং বাসানিওর সম্পর্কে ফাটল ধরানো
 - তার জিষাংসা চরিতার্থ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সোনাপুর গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ইমরান সাহেবের কাছে দায়িত্ব জালাল মিয়া কন্যার বিয়ের জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাকে ৫০০০ টাকা দিলেন। প্রচণ্ড খরায় দিশেহারা কয়েকজন কৃষক তার কাছে কিছু খণ্ড চাইলে বিনা শর্তে তাদের প্রত্যেককে ২০০০ টাকা করে দিলেন এবং সুবিধাজনক সময়ে ফেরত দিতে বললেন। অন্যদিকে মোড়ল জমির সাহেব অসহায় মানুষদের চড়া সুন্দে খণ্ড দেন এবং সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে নেন। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অনেকের ‘জমি কেড়ে নেন’।

ক. ইছুদি ব্যবসায়ীর নাম কী?

খ. এই ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের ধরন বর্ণনা কর।

গ. ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ গল্পের অ্যান্টনিও চরিত্রের যে ‘বৈশিষ্ট্য’ ইমরান সাহেবের মধ্যে লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের জমির সাহেব ও গল্পের শাইলক মানবতার শক্তি— বিশ্লেষণ কর।

২. আলীবাবা ও কাশেম দুই ভাই। ঘটনাচক্রে আলীবাবা এক পাহাড়ে ডাকাত দলের অনেক সম্পত্তির সঞ্চান পায়। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করে অল্প কিছু সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। তার ভাই কাশেম চালাকি করে ডাকাত দলের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আলীবাবার কাছ থেকে সেই স্থানের খবর জেনে নেয়। এরপর সম্পদ চুরি করতে গিয়ে ডাকাত দলের হাতে ধরা পড়ে ও মৃত্যুবরণ করে।

ক. শাইলকের কীসের ব্যবসা ছিল?

খ. বাসানিওকে ‘ভাগ্যবান’ বলা হয়েছে কেন?

গ. আলীবাবার সাথে ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ গল্পের অ্যান্টনিওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপক ও ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ গল্পের মূলসূর একই— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

ରିପତ୍ୟାନ ଉଇଂକଲ

ଫଖରୁଜ୍ଜାମାନ ଚୌଧୁରୀ

[ଓଡ଼ୟାଶିଥିଟନ ଆରଭିଂ ରଚିତ ଗଲ୍ଲ ଅବଲମ୍ବନେ]

ହାଡସନ ନଦୀର ଉପର ଦିଯେ ଜାହାଜେ କରେ ଯାରା ଗେଛେ ତାଦେର ସବାରଇ ଦୃଷ୍ଟି କେଡ଼େହେ କ୍ୟାଟ୍ସକିଳ ପାହାଡ଼ଗୁଲୋ । ନଦୀର ପଞ୍ଚମ ଦିକେ ସଗୋରବେ ଦାଁତିଆୟେ ଆଛେ ଏ ପାହାଡ଼ଶ୍ରେଣି ।

ଏସବ ବୁପକଥାର ପାହାଡ଼ର ନିଚେ ଆଛେ ଏକ ଗ୍ରାମ । ଅନେକ ବହର ଆଗେ ସେ ଗ୍ରାମେ ବାସ କରତ ଏକଜନ ଲୋକ; ନାମ ତାର ରିପତ୍ୟାନ । ଉଇଂକଲ ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟ ବଲେ ରିପତ୍ୟାନ ଉଇଂକଲ ନାମେହି ସବାର କାହେ ଛିଲ ତାର ପରିଚଯ ।

ଗ୍ରାମେର ସବାଇ ତାକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସତ । ଛେଲେରା ତାକେ ପଥେ ଦେଖିଲେହି ଆନନ୍ଦେ ଚିତ୍କାର କରେ ଉଠିତ । ଖେଳାଧୂଳାର ବ୍ୟାପାରେ ଛେଲେଦେର ସେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରତ, ତାଦେର ଖେଳାର ଜିନିସ ବାନିଯେ ଦିତ, ସୁଡି ଓଡ଼ାନୋ ଶେଖାତ, ମାର୍ବେଲ ଖେଳା ଶେଖାତ ।

ରିପେର ଏହି ଆଜ୍ଞାବାଜ ମନୋଭାବ ଗ୍ରାମେର ଅଳସ ବନ୍ଧୁରା ମେନେ ନିଲେଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମେନେ ନିଲ ନା । ନିଜେର କୋନୋ ଦୋଷ ଥୁଜେ ପାଇଁ ନା ରିପ । ଦୋଷେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ କଥିନୋ ବିଶେଷ କାଜ କରତ ନା । ପରିଶ୍ରମ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟେର ଭୟେ ବିନ୍ଦୁ ସେ ଅମନ କରତ ନା । କାରଣ ପ୍ରାୟଇ ସେ ଏକ ଟୁକରୋ ଭିଜେ ପାଥରେର ଉପର ବସେ ଥାକତ । ହାତେ ଥାକତ ଇହା ବଡ଼ ଏକ ଲାଠି । ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟଭାବେ ବସେ ବସେ ସେ ମାଛ ଧରତ । କିନ୍ତୁ ତୁଳେଓ କୋନୋ ମାଛ ତାର ବଡ଼ିଶିତେ ଧରା ପଡ଼ିତ ନା । ସେ ଏକଟା ଫାଁଦ କାଥେ କରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଆର ବନବାଦାଡ଼େ ଘୁରେ ବେଡ଼ାତ କାଠବିଡ଼ାଳି ଆର ବୁନୋ କବୁତର ଧରାର ଜନ୍ୟ । ପାଡ଼ାପଢ଼ିର ସବଚେଯେ କଠିନ କାଜଟାଓ ସେ କରେ ଦିତ । ଟେକିତେ ଧାନ ଭାନତେ ଅଥବା ପାଥରେର ପାଚିର ଗଡ଼ିତେଓ ସେ ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରତ । ଏକକଥାଯ ରିପତ୍ୟାନ ଉଇଂକଲ ଅନ୍ୟେର ଉପକାର କରେ ଦେଓୟାର ଜନ୍ୟ ସବସମୟ ରାଜି ଥାକତ ।

ରିପତ୍ୟାନ ଉଇଂକଲେର ଛେଲେଗୁଲୋ ଖୁବ ବଞ୍ଜାତ ହୁଁ ହେଉ ଉଠିଲ । ବାପେର ହଙ୍ଗଛାଡ଼ା ତାବ ତାଦେରକେ ଆରଓ ଅଳସ ହବାର ଜନ୍ୟ ସାହସୀ କରେ ତୁଳନ । ରିପତ୍ୟାନେର ତବୁ ଜାନ ହଲୋ ନା । ନିଜେଓ ସରଳ ଜୀବନ୍ୟାପନ କାମନା କରେ । ପରିଶ୍ରମ କରେ ଟାକା ଝାଙ୍ଗାରେର ଚେଯେ ଉପୋସ ଥାକାଇ ଯେନ ଶ୍ରେୟ ।

ରିପତ୍ୟାନ ଉଇଂକଲ ହେସେ-ଖେଲେ ଜୀବନ କଟାଲେଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବସମୟ ଆଲସେମି ଆର ଅସାବଧାନତାର ଜନ୍ୟ ସୟନ୍ୟାନ କରତ । ପରିବାରଟାକେ ସେ ଧରହୁ କରଛେ ବଲେଓ ତାକେ ସେ ଗାଲ ଦିତ । ରିପ ଶୁଦ୍ଧ କାଥ ଦୁଲିଯେ, ମାଥା ଉଚିଯେ, ଚୋଥ ବନ୍ଧ କରେ କୋନୋ କଥା ନା ବଲେ ତାର ଜବାବ ଦେଯ । ଆର ମାଝେ ମାଝେ ସେ ବାଡ଼ିର ବାଇରେ ଚଲେ ଗିଯେ ବାଗଡ଼ା ଲାଗା ବନ୍ଧ କରେ ।

ରିପେର ଏକମାତ୍ର ପୋଥା ପ୍ରାଣି ଛିଲ ତାର କୁକୁର ଉଲ୍ଫି । କୁକୁରଟାଓ ତାର ମନିବେର ମତୋଇ ରିପେର ସ୍ତ୍ରୀର କାହେ ଅବଜ୍ଞା ଆର ଲାଞ୍ଛନା ଲାଭ କରତ । ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ କରତ, କୁକୁରଟାଇ ତାର ମନିବେକେ ବେଯାଡ଼ା କରେ ତୁଳେହେ । କାରଣ କୁକୁରଟାଇ ଛିଲ ରିପେର ଏକମାତ୍ର ଭରଣସଙ୍ଗୀ । ଆର କୁକୁରଟା ଯେନ ତାବତ, ‘ବେଚାରା ରିପ, କାନ୍ଦୀ ତୋର ସାଥେ ଖୁବ ଖାରାପ ବ୍ୟବହାର କରେଛେ? ଆମି ବୈଚେ ଥାକତେ ତୋର ବନ୍ଧୁର ଅଭାବ ହେବେ ନା ।’ ଉଲ୍ଫି ହ୍ୟାତୋ ସମସ୍ତ ହଦୟ ଦିଯେ ମନିବେର ଦୁଃଖ ବୋଝାର ଚେଷ୍ଟା କରତ ।

শরৎকালের একদিন। রিপ ক্যাটস্মুকিল পাহাড়ের একটা অংশে বসে ছিল। বসে বসে সে কাঠবিড়ালি শিকার করছিল। বন্দুকের শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে একসময় সে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। রিপ দেখল, নিচে তরতর করে বয়ে চলেছে হাডসন নদী। নদীর বুকে পড়েছে বেগুনি রঞ্জের ছায়া।



রিপ উঠে নিচে নামতে যাবে, এমন সময় হঠাতে সে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। চারাদিকে তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। ভাবল, তার শোনার ভুল হতে পারে। কিন্তু আবারও শুনতে পেল সেই ডাক, ‘রিপভ্যান উইৎকল’।

কুকুরটা ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। রিপের একটু ভয় হলো। সে তাকিয়ে দেখল, অঙ্গুত একটা লোক পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। লোকটাকে রিপ চিনতে পারল না। হতে পারে কোনো সাহায্যপ্রাপ্তী, তাই রিপ এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটা সত্যি অঙ্গুত আকৃতির। মাথায় একবীক ভারী চুল, মুখে কচকে দাঢ়ি। আর পোশাক পুরোনো ওল্ডমার্জ ধাঁচের। কাপড়ের জামায় তার বুক ঢাকা। পরনে ব্রিচেস। চিলেচালা ব্রিচেসের গায়ে বোতাম লাগানো, আর ইট্টুর দিকটা বেশ উচু। কাঁধে তার মদ ভরা একটা ভাস। সে রিপের কাছে এসে বোঝা নিয়ে সাহায্য করতে ইশারা করল।

বোঝা ভাগাভাগি করে তারা পাহাড় বেয়ে নেমে এল। রিপ শুনতে পেল পাহাড়ের মাঝে যেন বাজ ডাকছে। থমকে দাঁড়াল সে। কিন্তু সাহসে ভর করে আবার লোকটাকে অনুসরণ করল। ওরা কিছুক্ষণ পর উন্মুক্ত একটা খাদে এসে পৌঁছাল। উপরে গাছের ডালের ফাঁকে আকাশ আর মেঘ দেখা যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত রিপ আর তার সঙ্গী কোনো কথা না বলে পথ ইঁটছিল। লোকটা সম্বন্ধে রিপ নানা কথা ভাবতে সাগল।

উন্মুক্ত খাদে রিপ আরেকটা অঙ্গুত জিনিস দেখল। জায়গাটার মাঝখানে বসে কতগুলো অঙ্গুত লোক কী যেন খেলছে। তাদের পোশাকও অঙ্গুত গোছের। তাদের কেউ পরেছে ছেউ পাজামা, আবার কেউ পরেছে জামা।

তাদের বেল্টের সাথে ছুরি ঝোলানো। এদের প্রত্যেকে রিপের সাথির মতো ব্রিচেস পরেছে। তাদের মুখও অঙ্গুত রকমের। কারও মাথা বড়, কারও মুখ বড়, আর শুয়োরের মতো ছোট ছোট চোখ। আবার কারও মুখ যেন নাকের সমান। মাথায় সাদা পাউরুটির মতো হ্যাট, হ্যাটে মোরগের ছোট লাল পালক বসানো। এদের রংয়েছে ভিন্ন আকার আর রংজের দাঢ়ি।

এদের মধ্যে যে সর্দার তাকে দেখলেই চেনা যায়। সে একজন বুড়ো মানুষ। রিপ দেখে অবাক হলো, লোকগুলো আমোদপ্রিয় হলেও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে বসে আছে। ওদের দেখে তারা পৃতুলের মতো তাকিয়ে রাইল।

রিপ কেমন যেন ভড়কে গেল। তার সঙ্গী এবার ভাণ্ডের মদ একটা পাত্রে ঢেলে ওকে বসতে বলল। ভয়ে ভয়ে আদেশ পালন করল রিপ। লোকগুলো নীরবে মদ পান করে খেলতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে রিপের ভীতিভাব কেটে গেল। কেউ আর তার দিকে তাকিয়ে নেই দেখে সে সাহস করে মদ্য পানের কথা ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে বেচারার তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঢক ঢক করে সে মদ পান করতে লাগল, আর ধীরে ধীরে তার মাথা ভারী হয়ে এল, চোখ ব্যথ হয়ে এল। অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘূম থেকে জেগে রিপ দেখল সে সবুজ উপত্যকায় শুয়ে আছে। এখানেই লোকটার সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। চোখ রংগড়ে সে দেখল, সকাল হয়েছে। বনে বনে পাখি ডাকছে। তোরের বাতাস বইছে। কিন্তু সেই লোকগুলো আর নেই।

স্ত্রীর কথা মনে পড়ে ভীত হলো রিপ। বাইরে রাত কাটাবার কৈফিয়ত স্ত্রীকে সে কেমন করে দেবে। ‘ওহ বজ্জ অন্যায় হয়ে গেছে এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা’— মনে মনে উচ্চারণ করল রিপ।

তার বন্দুকের খৌজ করল সে। কিন্তু তার তেল-চকচকে পরিষ্কার বন্দুকটার পরিবর্তে সে দেখতে পেল ময়লা একটা বন্দুক পড়ে আছে। বন্দুকটার নলে মরচে ধরেছে, আর তার বাঁটি পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এবার তার সন্দেহ হলো, পাহাড়ের ভূতগুলো তার সাথে এই চালাকি করেছে। তাকে মদ খাইয়ে ঘূম পাড়িয়ে তার বন্দুকটা তারা ছুরি করেছে। উল্ফকেও ধারেকাছে কোথাও দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি এ ভূতুড়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল রিপ। কিন্তু যাবার কোনো পথ পেল না। পাথরগুলো দেয়ালের মতোই পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বেচারা রিপ শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডাকল। তার ডাকের জবাব দিল মরা গাছে বসে থাকা কিছু কাক ‘কা-কা’ করে।

অবশেষে মরচে—ধরা বন্দুকটা সম্বল করেই পথ খুঁজতে লাগল রিপ। বহু কষ্টে সে বেরিয়ে এল। তাকে যে করেই হোক বাড়িতে ফিরতেই হবে।

গ্রামের কাছে আসতে একদল লোকের সঙ্গে তার দেখা। আশ্চর্য, তাদের কাটুকে সে চেনে না। অথচ গ্রামের সবাই তার কতই না পরিচিত। এদের কাপড়চোপড়ও একটু নতুন ধরনের। এ ধরনের পোশাকের সাথে তার পরিচয় নেই। লোকগুলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর তাদের চিবুকে হাত বুলাচ্ছে। ওদের দেখাদেখি রিপও তাই করল, আর তখনই সে বুঝতে পারল তার চিবুকে ঝুলছে কয়েক ফুট লম্বা দাঢ়ি।

এবার গ্রামে চুকল সে। একদল ছেলেমেয়ে তার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল। কুকুরগুলো তার কাছ দিয়ে যাবার সময় ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল, যেন আজব এক চিড়িয়া দেখতে পেয়েছে তারা।

রিপ অনুভব করল রাতারাতি গ্রামের পরিবেশ বদলে গেছে। নতুন ধাঁচের সব বাড়িসহ, লোকজনের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেশি! কিন্তু তা কী করে সম্ভব হলো। দূরের পাহাড়, হাডসন নদী সবই তো ঠিক আছে, পথ ভুলে অন্য গ্রামে চুকে পড়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। গত রাতের মদের পাত্রটা তার এই অবস্থা করে ছেড়েছে।

অতিকষ্টে পথ চিনে সে নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগল। কিন্তু সে দেখল—তার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে, জানালা-দরজা সব ভেঙ্গে একাকার। অধিহনী একটা কুকুর বাড়ির আশেপাশে ঘুরছে। তাকে দেখতে অনেকটা উল্ফের মতোই মনে হয়। রিপ তার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কুকুরটা দাঁত খিচিয়ে চলে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকল রিপ। স্ত্রী ডেম ভ্যান উইংকল আর তার ছেলেদের খৌজ করল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে সত্যিই তার ভয় হলো।

এবার সে দৌড়ে তার পুরোনো আড়াখানা সরাইখানায় গেল। কিন্তু তারও কোনো পাত্র নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একখানা কাঠের ঘর। ঘরটার দরজায় লেখা, ‘দি ইউনিয়ন হোটেল’। মালিক : জোনাথন ডুলিটল।

লম্বা দাড়ি, মরচে ধরা বন্দুক আর একপাল ছেলেপিলেসহ রিপের দিকে হোটেলের সবারই দৃষ্টি পড়ল। তারা রিপকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তারা সবাই রাজনীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন করল রিপকে। কিন্তু সেসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।

রিপের কানের কাছে একজন মুখ এনে জিজেস করল, রিপ ফেডারেল, না গণতন্ত্রী। এবারেও রিপের বোকা হবার পালা। একজন বিশিষ্ট এবং সবজাত্তা লোক ভিড় ঠেলে রিপের কাছে এগিয়ে এল। মাথায় তার টুপি আর হাতে ছড়ি। সে এসে হুঞ্জার ছাড়ল কেন রিপ তোটের সময় বন্দুক কাঁধে দলবল নিয়ে এসেছে এবং কেন সে দাঙ্গা বাধাতে চায়?

এবার লোকজন চিন্কার করে উঠল, ‘এই লোকটা গুঁপ্চর। উদ্বাস্তু। তাকে মার লাগাও।’

বিশিষ্ট লোকটি অতিকষ্টে শান্তি রক্ষা করল। অচেনা অপরাধীর পরিচয় জানতে চাইল। বেচারা রিপ সবিনয়ে বলল যে, তাদের কোনো ক্ষতি করবে না সে। সে এসেছিল তার প্রতিবেশীদের খৌজখবর নিতে।

‘ঠিক আছে তাদের নাম বলো।’

রিপ একটু থেমে বলল, ‘নিকোলাস ডেভার কোথায়?’

কতক্ষণ সবাই চুপ থাকার পর এক অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি সরু গলায় জবাব দিল, ‘সে তো আঠারো বছর আগে মারা গেছে।’

‘ত্রুম ডুচার কোথায়?’

৫২ ‘সে তো যুদ্ধ শুরু হতেই সৈন্যদলে যোগ দিয়ে চলে গেছে এবং মারাও গেছে বলে আমরা জেনেছি।’

‘স্কুল মাস্টার ভ্যান বৃশেল কোথায়?’

‘সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। সেখানে সে বড় পদও পায়। এখন সে একজন কংগ্রেসি।’

বন্ধুদের এরকম পরিবর্তন ও পৃথিবীতে তাকে একা দেখে রিপের হৃদয় দমে গেল। প্রতিটা উভ্র আর দৃশ্যই তাকে হতভম্ব করতে লাগল। এমতাবস্থায় হ্যাট পরা লোকটি আবার জিজেস করল, ‘কিন্তু তুমি কে?’

‘খোদা জানেন’, রিপ কেঁদে উঠল, ‘আমি আর আমি নেই। আমি অন্য কেউ। তা না হলে এক রাতের ব্যবধানে কী এত পরিবর্তন আসে? আমি পাহাড়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পাহাড়িরা আমার বন্দুক বদলে দিয়েছে।’

উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ মাথা বাঁকাতে লাগল। একজন ছোঁ মেরে বন্দুকটা কেড়ে নিল। ছড়ি আর টুপিওয়ালা লোকটা গোলমাল আশ্বাস করে দ্রুত সরে পড়ল।

ঠিক তখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ফিটফাট একজন মহিলা। ছাইরঙ্গের বৃন্দ লোকটাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার কোলে একটি শিশু। শিশুটা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করলে মহিলাটি বলল, ‘এই রিপ থাম, ও তোকে কিছু করবে না।’ শিশুটির নাম ও তার মায়ের কঠোর রিপের মনে পুরাতন শৃঙ্খল জাগিয়ে দিল। ‘তোমার নাম কী গো?’ জিজেস করল সে।

‘জুনিথ গার্ডনার’।

‘বাপের নাম?’

‘আহা, তাঁর নাম ছিল রিপভ্যান উইংকল। কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে সেই যে তিনি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর ফেরেননি। তার কুকুরটা একা একা ফিরে এসেছে। তিনি কি বন্দুক নিয়ে আতঙ্ক করেছেন, না ইভিয়ানরা তাঁকে মেরে ফেলেছেন, কেউ তা বলতে পারে না। তখন আমি এতটুকুন ছিলাম।’

রিপের তখন আর একটা কথা জিজেস করা বাকি।

‘তোমার মা কোথায়?’

‘আহা, তিনিও কদিন আগে মারা গেছেন।’

এবার রিপ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মেয়ে আর নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমি তোমার বাবা। একসময়ের যুবক রিপভ্যান উইংকল আজ হাজিসার বুড়ো।’

সবাই তো একদম অবাক। ভিড় ঠেলে এক বুড়ি এসে ভুরুর উপর হাত রেখে বলল, ‘সত্যি! রিপভ্যান উইংকলই বটে। বুড়ো প্রতিবেশী, এসো এসো, বিশ বছর কোথায় ছিলে?’

রিপ তার কাহিনী বলল। দীর্ঘ বিশ বছর তার কাছে এক রাত্রি মোটে! এমন তাঙ্গব কথা কে শুনেছে কবে।

পিটার হলো এখানকার পুরোনো অধিবাসী এবং এখানকার লোকদের সম্বন্ধে তার পুরো জ্ঞান। সে রিপের কথাগুলো বিশাস করল; সে আরও বলল যে, তার বৎশের ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ক্যাট্সকিল পাহাড়ে অঙ্গুত ধরনের লোক সত্যি আছে। তারা নাকি উন্মুক্ত খাদে খেলা করে বেড়ায় এবং পাহাড়ের মধ্যে বাজের মতো শব্দও শোনা যায়।

রিপভ্যান উইংকল আর কিছুই নয়—সেই ঐতিহাসিকদের কথা প্রমাণ করে এল মাত্র।

সার-সংক্ষেপ

ওয়াশিংটন আরভিং রচিত ‘রিপ্যান উইকেল’ একটি কল্পকাহিনীভিত্তিক উপন্যাস। যারা রহস্যগন্ধ পড়তে পছন্দ করে তাদের কাছে যুগ যুগ ধরে এটি সমাদৃত। যুক্তিশাহ্য নয় এমন লেখা যারা পড়তে চায় না, তাদের কাছেও এই উপন্যাসটি অত্যন্ত প্রশংসিত। রিপ্যান উইকেল উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত আকারে গল্পে রূপায়ণ এই লেখাটি।

গল্পে দেখা যায় রিপ্যান একজন অলস প্রকৃতির মানুষ। বাস করত হাডসন নদীর তীরে ক্যাটস্কিল পাহাড়ের পাদদেশে একটি ছোট গ্রামে। গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। তবে সে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করত। কাঠবিড়ালি আর কবুতর ধরার জন্য একটা ফাঁদ কাঁধে নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। এ বিষয়টি তার স্ত্রী মোটেই পছন্দ করত না। স্ত্রীর বকুনি থেকে বাঁচার জন্য একদিন সে তার পোষা কুকুর উল্ফ আর তার বন্দুক নিয়ে চলে যায় ক্যাটস্কিল পাহাড়ের এক প্রান্তে। সেখানে সে একদল অচেনা আঙুত রকমের লোকের দেখা পায়। তাদের দেওয়া এক ধরনের পানীয় পান করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙে বিশ বছর পর। যদিও তার কাছে মনে হয় মাত্র একটি রাত্রি। এত বছর পর গ্রামে ফিরে এসে সে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করে। বুড়োরা ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারে না। ঘটে যায় নানা ধরনের মজার মজার ঘটনা।

এইসব ঘটনা নিয়ে ‘রিপ্যান উইকেল’ গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় যা শিক্ষার্থীরা পড়ে অনেক আনন্দ পাবে।

শব্দার্থ

সগৌরবে	-	গৌরবের সাথে।
আড়ডাবাজ	-	আড়ডা দিতে পাই।
বজ্জাত	-	দুষ্ট।
অবজ্ঞা	-	উপেক্ষা, ঘৃণা।
বেয়াড়া	-	একরোখা, খারাপ।
ওল্পন্দাজ	-	হল্যাত দেশের অধিবাসী।
উন্নৃত	-	খোলা।
কৈফিয়ত	-	জবাবদিহি।
উপত্যকা	-	দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি।
অনাহারী	-	উপবাসী।
হতত্ত্ব	-	সত্ত্বিত, ভ্যাবাচ্যাক।
ঐতিহাসিক	-	ইতিহাস লেখক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জুনিথ গার্ডনার কে?

ক. রিপভ্যানের স্ত্রী	খ. রিপভ্যানের নাতনি
গ. ভ্যান বুশালের মেয়ে	ঘ. রিপভ্যানের মেয়ে
২. 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে নারীর কোলের শিশুটি কী দেখে ভয় পেল?

ক. অচেনা বৃক্ষ	খ. বন্দুক
গ. লাঠি	ঘ. কুকুর
৩. নারীর কষ্টস্বর শুনে রিপের কোন স্মৃতি জেগে উঠল?

ক. পুরাতন দিনের	খ. বন্ধুদের
গ. স্ত্রী-কন্যার	ঘ. শিশুপুত্রের
৪. "এখানকার লোকদের সম্বন্ধে তার পুরো জ্ঞান" পিটার সম্পর্কে লেখকের এ উক্তির কারণ হলো-
 - i. সবার প্রতি পিটারের ভালো আচরণ
 - ii. পিটার এলাকার সার্বিক বিষয় জানে
 - iii. মানুষ চিনতে পিটারের কখনো ভুল হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আকৃতিক দুর্যোগ সিডের বাংলাদেশের দক্ষিণাধ্যলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। উপকূলের বাসিন্দা আসমত আলী বাড়ি ও প্রবল শ্রাতের টানে ভেসে যান। উদ্ধারকারী দল তাকে তুলে নেয়। মাথায় আঘাতের কারণে তার কিছুই মনে থাকে না। অন্য দীর্ঘদিন বসবাস করেন তিনি। পরবর্তীতে একজন সমাজকর্মী আসমতকে মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। চিকিৎসায় ধীরে ধীরে আসমত তালো হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। এলাকার কোনো মানুষজন, রাস্তাঘাট ঠিকমতো চিনতে না পারলেও আসমতকে ফিরে পেয়ে বাড়ির সবাই আনন্দে আত্মহারা।

ক. রিপভ্যান উইংকলের স্ত্রী সবসময় ঘ্যান ঘ্যান করত কেন?	খ. রিপ নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না কেন?
গ. উদ্দীপকের আসমত আলীর সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।	ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের আসমত আলী ও রিপের হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. ছোটবেলা থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন রিপন সাহেব। কোনো কাজকেই তিনি ছোট মনে করেননি, যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন তখনই তা আগ্রহ নিয়ে করেছেন। ভাগ্যান্বযণে তিনি বউ ও মেয়েকে বাড়িতে রেখে মালয়েশিয়া চলে যান। দুই বছর চাকরি করার পর সহকর্মীর চক্রান্তে তিনি মামলাতে জড়িয়ে পড়েন। চৌদ্দ বছর জেল খেটে তিনি বল্ককষ্টে দেশে ফিরে আসেন। ততোদিনে তার মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। বাড়ির লোকজন রিপনকে পেয়ে খুশি হন।

- ক. রিপের পোষ্য প্রাণীর নাম কী?
- খ. রিপ ঘুমিয়ে গিয়েছিল কেন? বর্ণনা কর।
- গ. উদ্দীপকের রিপন ও ‘রিপত্যান উইংকল’ গল্লের রিপের স্বভাবগত দিক ছিল ভিন্ন?’— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পরিণতিতে মিল থাকলেও উদ্দীপকটি ‘রিপত্যান উইংকল’ গল্লের পুরো বিষয়টি ধারণ করে না-যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সাড়ে তিন হাত জমি

মূল: লেভ তলস্তয়

রূপান্তর : প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

বড় বোন ব্যবসায়ীর স্ত্রী, থাকে শহরে। ছোট বোন কৃষকের স্ত্রী, থাকে গ্রামে। বড় বোন এসেছে ছোট বোনের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে। চা খেতে খেতে দুই বোন গল্প করছিল। বড় বোন বলছিল শহরে থাকার সুযোগ—সুবিধার কথা। বেশ বাড়িয়ে বলা। যাকে বলে গল্প দেওয়া। ছোট বোনও গ্রামে থাকার ভালো দিকগুলোর কথা বলে।

ছোট বোনের স্বামী পাখোম সব শুনছিল। সে বলল, ‘কথা ঠিক। ছোটবেলা থেকেই মাটির কোলে পড়ে আছি। তাই বলে তেমন কোনো অভাব নেই। অভাব কেবল একটিই, আমার জমি খুব কম। জমি যদি পাই তা হলে কাউকে পরোয়া করব না, স্বয়ং শয়তানকেও না।’

শয়তান শুনে বেশ খুশি হলো। ভাবল, একে নিয়ে মজার একটা খেলা খেলবে। আগে অনেক জমি দেবে, তারপর কেড়ে নেবে।

পাখোমের জমি ক্রয়

পাখোমের বাড়ির কাছে একজন মহিলা বাস করতেন। তিনি ছিলেন ২৪০ একর জমির মালিক। ভালো মানুষ তিনি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ভালো। অবসরপ্রাপ্ত একজন সৈনিককে জমিদারির ওভারশিয়ার নিযুক্ত করলেন তিনি। ওভারশিয়ার লোকটি ভালো নয়। নানা ছলচুতায় কৃষকদের জরিমানা করে সে। কারও গুরু, ঘোড়া, বাছুর জমিজিরাতে ঢুকলেই সে জরিমানা করে, অত্যাচার করে। এরই মধ্যে শোনা গেল জমিদার মহিলা তার সব জমি বিক্রি করে দেবেন। আর ওভারশিয়ার কিনে নেবে তার সম্পত্তি। কৃষকরা খুব দুঃখিতায় পড়ে। শেষে সবাই মিলে বেশি দামে জমি কেনার প্রস্তাব দেয় মহিলাকে। মহিলা রাজি হলেন। কিন্তু শয়তানের ইন্দ্রনে তারা একত্র হতে পারছিল না। তাই যার যার মতো জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়।

পাখোমের ১০০ বুবল আগেই ছিল। তারপর একটি গাধার বাচ্চা ও অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করল সে। ছেলেকেও পাঠিয়ে দিল চাকরিতে। এভাবে বাকি অর্ধেক টাকা জোগাড় হলো। সব টাকা জুটিয়ে সে তিরিশ একর জমি ও ছোট একটি বাগান ক্রয় করল। বেশ, পাখোম হয়ে গেল জমির মালিক। তারপর নতুন জমিতে বীজ বুল্ল, ফসল ফলল প্রচুর। এক বছরের মধ্যেই সে মহিলার সমস্ত টাকা শোধ করে দিল। এখন সে জমির পুরো মালিক। ঘোড়ায় চড়ে সে জমিজমা দেখতে গিয়ে আনন্দে অভিভূত হয়। গভীর যত্ন আর মায়া দিয়ে সে ফসল ফলাত। তার জমির ঘাসগুলো, ফুলগুলো— সবই যেন আলাদা। মন তার আনন্দে ভরে উঠে।

পাখোমের বাড়িতে অতিথি চারি

একজন চাষি পাখোমের বাড়ি আসে। পাখোম তাকে থাকতে দেয়, খেতে দেয়। সে জানায়, ভলগার ওপার থেকে সে এসেছে। সে আরও বলে, সেখানে নতুন একটি পন্থনি হয়েছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নাম লেখালেই ১০০

একর জমি পাওয়া যায়। আর সে কী জমি! সোনার টুকরো। লোকটি আরও বলে, একজন গরিব চাষি ছিল। কাজ করার দুখানা হাত ছাড়া কিছুই তার ছিল না। এবার সে ১০০ একর জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। গত বছর শুধু গম বেচে সে আয় করেছে ৫০০০ রুবল। শুনে পাখোম উদ্বেগিত হয়ে উঠল।

তার বর্তমান সহায়—সম্পত্তি নিয়ে সে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সুতরাং গরম পড়তেই সে বেরিয়ে পড়ল। ভলগা নদীতে স্টিমারে চড়ে পৌছল সামারা। সেখান থেকে প্রায় ২৭৪ মাইল পায়ে হেঁটে পৌছল গন্তব্যে। গিয়ে দেখল, যা সে শুনেছে সবই ঠিক। অতি অল্প দামে উর্বর জমি কেনা যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, প্রতি একরের দাম মাত্র ১.৫০ রুবল। পাখোম বাড়িতে ফিরে জমিজিরাত বিক্রি করে দেয়। বসন্তের শুরুতে সে স্ত্রী—পুত্র নিয়ে সেই নতুন দেশে পাড়ি জমায়।

নতুন দেশে পাখোম

নতুন দেশে এসে পাখোম এ সমাজের সদস্য হয়। আর সদস্য হওয়াতেই সে লাভ করে ১০০ একর জমি। গো—চারণ ভূমি তো আছেই। এখানে জীবনযাপন আগের চেয়ে দশগুণ ভালো। পাখোম নতুন নতুন জমি কেনে। ফসল বোনে। লাভ হয় প্রচুর। একবার তো ১০০০ একর জমি মাত্র ১৫০০ রুবলে কিনে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এ সময় একজন মহাজন বাড়িতে এসে উঠে। সে জানায় অনেক অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে সে এসেছে। সেখানে জমির দাম খুবই সম্মত। ১০০০ রুবল দিয়ে সে ১০,০০০ একর জমি কিনেছে। পাখোমকে জমির দলিলটিও দেখাল। লোকটি আরও জানায় যে, মানুষগুলো একেবারে ভেড়ার মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে কোনো জিনিস তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং পাখোম কেন ১৫০০ রুবল দিয়ে ১০০০ একর জমি কিনবে? ঐ রুবল দিয়ে সে তো একজন জমিদারই বনে যেতে পারে।

বাসকিরদের দেশে পাখোম

একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে বাসকিরদের দেশে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল পাখোম। সঙ্গে নিল কিছু উপহার। প্রায় ৩৩২ মাইল পথ হেঁটে গেল তারা। তারপর সাত দিনের দিন বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। মহাজন যেমন বলেছিল সব ঠিক সেরকমই। খোলা প্রান্তরের নদীটির তীরে এরা বাস করে। ঘরবাড়ি নেই। আছে চামড়ার ছাউনি দেওয়া গাড়ি। এর মধ্যেই তাদের বসবাস। এরা জমি চাষ করে না, ফসল ফলায় না। জমিতে চরে বেড়ায় ঘোড়া, গরু, মহিষ। ঘোড়ার দুধ এদের প্রিয় খাদ্য। তেড়ার মাংসও খায়। দুধ থেকে তৈরি কুসিম তাদের পানীয়। এরা সহজ—সরল, দয়ালু ও হাসিখুশি। পাখোমকে দেখেই তারা গাড়ি থেকে নেমে অভ্যর্থনা জানাল, আদর—আপ্যায়ন করল। পাখোমও তাদের উপহার দিল। বিনিময়ে তারা জানতে চাইল যে পাখোম কী চায়? তারা জানল, পাখোম জমি কিনতে চায়। শুনে তারা অতিথির প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলো। তারা বলল, ‘আপনি যত জমি চান তত জমি আমরা বিক্রয় করতে রাজি।’ এ সময় তাদের নেতা স্টার্শিনা এসে সবিক্ষু শুনলেন। তিনিও জানালেন, পাখোম যত খুশি জমি ক্রয় করতে পারে। জমির দাম দিনপ্রতি ১০০ রুবল। ‘দিনপ্রতি’ ব্যাপারটা পাখোম বুঝে উঠতে পারল না। নেতা জানালেন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে ততটুকু জমির মূল্য।

ପାଖୋମେର ସ୍ବପ୍ନ

ପାଖୋମ ଶୁଯେଛିଲ ପାଖିର ପାଲକେର ବିଚାନାୟ । ଖୁବ ଆରାମଦାୟକ । କିନ୍ତୁ ତବୁ ତାର ଘୁମ ହୟନି । ଅନେକ ଜମିର ମାଲିକ ହତେ ଯାଚେ ସେ । ୨୦,୦୦୦ ଏକର ତୋ ବଟେଇ । ଚିନ୍ତାଯ ଉତ୍ତେଜନାୟ ସାରା ରାତ ମେ ଘୁମୋତେ ପାରଲ ନା । କିନ୍ତୁ ତୋରେର ଦିକେ ମେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ିଲ । ଏକଟା ସ୍ଵପ୍ନଓ ଦେଖିଲ । ବାଇରେ ଯେନ କାର ହାସିର ଶବ୍ଦ । ସ୍ଵପ୍ନେଇ ମେ ବେରିଯେ ଗେଲ । ଦେଖିଲ ସ୍ଟାର୍ଶିନା । ଏକଟୁ ଏଗିଯେ ଦେଖିଲ ଲୋକଟି ସ୍ଟାର୍ଶିନା ନୟ, ସେଇ ମହାଜନ । ଏହି ଲୋକଟିଇ ତାକେ ଏଥାନେ ଆସତେ ବଲେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେଇ ଲୋକଟି ଯେନ ବଦଳେ ଗେଲ । ଏଥିନ ମେ ଡଲଗାର ଭାଟି ଥେକେ ଆସା ଦେଇ ଚାଷି । ସବ ଶେଷେ ପାଖୋମ ଦେଖିଲ, ଏ ହଚେ ଏକଟି ଶୟତାନ; ମାଥାଯ ଶିଂ, ପାଯେ ଖୁର । ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରେ ମେ ହାସିବେ । ଅଦୂରେ ଏକଟି ଲୋକ ପଡ଼େ ଆଛେ । ତାର ମୁଖ କାଗଜେର ମତୋ ସାଦା । ଲୋକଟିର ଦିକେ ତାକିଯେ ପାଖୋମ ଦେଖିଲ, ଲୋକଟି ମେ ନିଜେ । ତାର ଦମ ଯେନ ଆଟକେ ଏଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭେଣେ ଗେଲ ଘୁମ । ଚାରଦିକେ ଫର୍ସା ହୟେ ଗେଛେ । ଏଥିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବେ । ତାକେ ଜମି ଦଖଲେର ଦୌଡ଼ ଶୁରୁ କରିବେ ହବେ ।

ପାଖୋମେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜମି

ଶିକାନ ନାମେ ଏକଟି ଗୋଲ ପାହାଡ଼ । ଏହି ପାହାଡ଼ର ଉପର ସ୍ଟାର୍ଶିନା ତାର ଟୁପି ରାଖିଲ । ଟୁପିର ମଧ୍ୟେ ପାଖୋମେର ୧୦୦ ବୁଲା । ଏଥାନ ଥେକେଇ ତାର ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ । ପାଖୋମ ଦେଖିଲ ସବହି ଉର୍ବର ଜମି, ସୋନାର ଟୁକରୋ । ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରେ ମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଉଦୟର ଦିକେ ଯାତ୍ରା କରିଲ । ଆମେତେବେ ନୟ, ଖୁବ ଜୋରେଓ ନୟ । ୧୧୬୬ ଗଜ ଯାବାର ପର ମେ ଏକଟୁ ଥାମଲ । ଏକଟି ଖୁଟି ପୁତଳ । ଏଥିନ ମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପା ଫେଲେ ଚଲିଲ ଲାଗଲ । ଥେମେ ଆର ଏକଟି ଖୁଟି ପୁତେ ଦିଲ । ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦିକେ ତାକାଲ ଏକବାର । ଗୋଲ ପାହାଡ଼ଟାର ଉପର ଆଲୋ ପଡ଼େଛେ । ପାହାଡ଼ର ଉପର ଦାଢ଼ିଯେ ଥାକା ମାନୁଷଗୁଲୋର ଉପରାତ୍ମକ ଆଲୋ ପଡ଼େଛେ । ହିସାବ କରେ ଦେଖିଲ, ପ୍ରାୟ ସାଡେ ତିନ ମାଇଲ ପଥ ହାଟା ହୟେଛେ । ଆରାଓ ସାଡେ ତିନ ମାଇଲ ହେଟେ ମେ ବଁ-ଦିକେ ମୋଡ଼ ନେବେ । ଶରୀର ତାର ଗରମ ହୟେ ଉଠେଛେ । କୋଟ ଖୁଲେ ଫେଲିଲ, ଜୁତାଓ । ହାଟିଲେ ତାର ଖୁବ ଭାଲୋ ଲାଗିଲ । ତାଇ ଭାଲୋ ଭାଲୋ ଜମି ଦେଖେ ବଁକ ମୋଡ଼ ନିତେ ଲାଗଲ ।

ଗୋଲ ପାହାଡ଼ଟା ଏଥିନ ଆର ଦେଖା ଯାଇ ନା । ପାଖୋମ ଭାବଲ : ମୋଡ଼ଟା ବେଶ ବଡ଼ ହୟେଛେ ନିଶ୍ଚଯ । ତାର ଶରୀର ଥେକେ ଘାମ ଝରିଛେ । ମେ କ୍ଲାନ୍ଟ ବୋଧ କରିଛେ । ମେ ଖାନିକଟା ପାନି ଖେଲ । ଏକଟି ଖୁଟିଓ ପୋତା ହଲୋ । ପଥେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ । ଭ୍ୟାପସା ଗରମ । ତାର ଭିତର ଦିଯେ ମେ ଛୁଟିଲେ ଲାଗଲ ।

ଠିକ ଦୁପୁରେ ମେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଟି ଖେଲ । ଦାଢ଼ିଯେ ସାମାନ୍ୟ ଜିରିଯେଓ ନିଲ । ମାଟିଲେ ମେ ବସିଲ ନା । କାରଣ ବସିଲେ ଶୁତେ ଇଚ୍ଛେ ହବେ, ଆର ଶୁଲେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ିଲେ ପାରେ । ବୁଟି ଖାଓଯାର ପର ହାଟିଲେ ସୁବିଧା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପରେଇ ତାର ଶରୀର ଭେଣେ ପଡ଼ିଲେ ଚାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ଶରୀରକେ ଆସକାରା ଦିଲେ ଚଲେ ନା । କେନନା ସାମାନ୍ୟ କହେଇ ତାର ଅନେକ ଲାଭ ।

ସାଡେ ଛୟ ମାଇଲ ପଥ ମେ ପେରିଯେଛେ । ତାର ପରାତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଉର୍ବର ଜମି ଛେଡ଼େ ଆସତେ ପାରେନି । କାମ କରେ ଛାଡ଼େ । ଚମତ୍କାର ତିସି ହବେ ଏ ଜମିଗୁଲୋତେ । ଗୋଲ ପାହାଡ଼ ଥେକେ ୧୦ ମାଇଲ ପଥ ଦୂରେ ଏସେହେ ମେ । ଆର ପଚିମ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଟା ହେଲେ ଗିଯେଛେ । ଅର୍ଥଚ ମେ ଫିରିଲେ ପେରେହେ ୧ ମାଇଲେର ଚେଯେ ସାମାନ୍ୟ ବେଶ । ଏଥିନ ମେ ଆର କୋନୋ ବଁକ ନିଚ୍ଛେ ନା । ସୋଜାସୁଜି ହେଟେଓ ମେ ଯେନ ଏଗୋତେ ପାରିଛେ ନା । ଜୁତା ମେ ଖୁଲେ ଫେଲେଛିଲ ଅନେକ ଆଗେଇ । ଏଥିନ ଖାଲି ପା କେଟେ ଛିଡ଼େ ଗିଯେଛେ । ହାଟିଲେ ତାର ଖୁବଇ କଷ୍ଟ ହେଚେ । ଶରୀର କାପିଛେ, ପା କାପିଛେ । ଏକଟୁ ବିଶାମେର ବଦଳେ ମେ ସବ କିନ୍ତୁ ଦିଯେ ଦିତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ବିଶାମ କରିଲେ ଚଲିବେ ନା । ତାଇ କେ ଯେନ ଚାବୁକ ମେରେ ମେରେ ତାକେ ହାଟିଯେ ନିଯେ ଯାଚେ । କତ ପଥ ବାକି । ଅର୍ଥଚ ମେ ମୃତ ପ୍ରାୟ । ଏତ ପଥ ମେ ପେରିଯେ ଏସେହେ । କାମ କରେ ତା ଫିରେ ଯାବେ ।

কিন্তু ফিরতে তাকে হবেই। সব অর্থ, সব পরিশৰ্ম বৃথা যেতে পারে না। পা ফেটে রক্ত ঝরছে। তবু সে দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে। তবু যেন এগোতে পারছে না। কোট, জুতা, ফ্লাস্ক, টুপি সব ছুড়ে ফেলে দিল। তবু দৌড়াতে তার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভিতর কে যেন হাপর টানছে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরে মারছে হাতুড়ি। পাদুটি দেহের ভার সহিছে না, তেওঁ পড়েছে।



জমির কথা সে ভুলে গেল। নিজেকে বাঁচানোই এখন একমাত্র চিন্তা। সূর্য এখন অস্ত যাওয়ার পথে। গোল পাহাড়ের লোকগুলো তাকে ডাকছে। চিন্কার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সে শেয়ালের চামড়ার টুপিটি মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। তার ভিতরে টাকা। তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টার্শিন। তার ঘনের কথা মনে হলো। তবু সে পৌছাতে চায়। নিজেকে সে খুন করেছে। তবু দৌড় বন্ধ করল না। সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন সে পাহাড় ছুঁয়েছে। একটি মুমুক্ষু জন্মে সে পাহাড় ডিঙিয়ে টুপিটি সর্প করল। সর্প করতে করতে সে নিচে পড়ে গেল। স্টার্শিন চিন্কার করে উঠল, ‘হায় যুবক, অনেক জমি ভূমি পেলে বটে।’ পাখোমের মজুর ছুটে গেল তার কাছে। তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তখন তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বহিছে। পাখোম মারা গেল। স্টার্শিন হাসতে লাগল। শেষে সাড়ে তিন হাত জমির মধ্যে পাখোমের সমাধি হলো।

ସାର-ସଂକ୍ଷେପ

ଅତି ଲୋଭେର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଲେ ଏକଜନ ମାନୁଷେର ଜୀବନେର କୀ ଭୟାବହ ପରିଣତି ହତେ ପାରେ ତାର ଏକଟି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ଏହି 'ସାଡ଼େ ତିନ ହାତ ଜମି' ଗଲ୍ପଟି । ଗଲ୍ପକାର ପାଖୋମ ନାମେର ଅତି ଲୋଭୀ ଏକଟି ଚରିତ୍ରେର ଜୀବନେ ଘଟେ ଯାଓଯା ନାନା ଘଟନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ନିପୁଣଭାବେ ଫୁଟିଯେ ତୁଳେଛେ ।

ଗଲ୍ପେ ଦେଖା ଯାଇ ରାଶିଯାର ଏକ ଗ୍ରାମେ ପାଖୋମ ନାମେ ଏକ କୃଷକ ବାସ କରତେନ । ତାର ନିଜେର ତେମନ କୋନୋ ଜମି-ଜମା ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ଜମିର ପ୍ରତି ତାର ଅନେକ ଲୋଭ । ମନେ ମନେ ତିନି ଏମନ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରତେନ ଯେ ତିନି ଯଦି କୋନୋଭାବେ ଅନେକ ଜମି ପାଇ ତାହଲେ ତିନି କାଟିକେ ପରୋଯା କରବେନ ନା । ତାର ମନେର ଏହି କଥା ଶୟତାନ ଶ୍ଵରେ ଫେଲେ ଏବଂ ତାକେ ଏକଟି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଖ୍ୟାର ପରିକଳ୍ପନା କରେ । ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୟତାନେର ପ୍ରାରୋଚନାଯ ତିନି ୩୦ ଏକର ଜମି ଓ ଏକଟି ବାଗାନ କ୍ରୟ କରେନ । ଏହି ଜମିତେ ଚାଷାବାଦ କରେ ତିନି ଅନେକ ଫସଲ ପାଇ । ଏତେ ତାର ହାତେ କିଛି ଟାକା ଜମେ । ଶୟତାନ ଆବାର ମାନୁଷେର ରୂପ ଧରେ ତାର କାହେ ଏସେ ତାକେ ଜାନାଯ ଯେ ଭଲଗା ନଦୀର ଓପରେ ଜମି ଖୁବଇ ସଞ୍ଚା ଏବଂ ଉର୍ବର । ଆରା ମଜାର ବ୍ୟାପାର ହଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚଶିଲେତେର ସଦସ୍ୟ ହଲେଇ ୧୦୦ ଏକର ଜମି ପାଓଯା ଯାଇ । ଜମି ପାଓଯାର ଏହି ଲୋଭ ପାଖୋମ ସାମଲାତେ ନା ପେରେ ଐ ଗ୍ରାମେ ଚଲେ ଯାଇ ଏବଂ ସେଖାନେ ବସବାସ ଶୁରୁ କରେନ । ଏରପର ଶୟତାନ ତାକେ ଆରା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯ ଏବଂ ବଲେ ପାଶେର ଦେଶେର ଜମି ଆରା ଉର୍ବର ଆରା ସଞ୍ଚା । ପାଖୋମ ଆବାର ବାସଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ପାଶେର ଦେଶେ ଚଲେ ଯାଇ । ଜମି କିନତେ ଗିଯେ ଜାନତେ ପାରେନ ଯେ ଦିନପ୍ରତି ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୦୦ ରୂପଳ । ଦିନପ୍ରତି ବଲତେ ଏକଦିନେ ଦେ ଯତ୍ତୁକୁ ଜମି ହାଟତେ ପାରବେ ତତ୍ତୁକୁ ତାର ହୟେ ଯାବେ । ଜମିର ଲୋଭେ ଏକଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟଦିନ ହତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ପ୍ରାଣପାତ କରେ ହାଟଲେନ । ଏକଟୁଓ ବିଶ୍ରାମ ନିଲେନ ନା । ଏତେ ତିନି ପରିମାଣେ ଅନେକ ବେଶି ଜମି ପେଲେନ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧବ୍ୟେ ପୌଛାର ପର ତାର ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହୟେ ଏଲ ଏବଂ କିଛିକଣ ପର ତିନି ମାରା ଗେଲେନ । ଅବଶ୍ୟେ ସାଡ଼େ ତିନ ହାତ ଜମିଇ ତାର ଶେଷ ଠିକାନା ହଲେ ।

'ଲୋଭେ ପାପ ପାପେ ମୃତ୍ୟୁ' ଏହି ସତ୍ୟଟି ଗଲ୍ପଟିର ମଧ୍ୟଦିଯେ ଅତି ଚମକ୍ରାରଭାବେ ପ୍ରକ୍ଷୁଟିତ ହୟେଛେ ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ମାଟିର କୋଳେ	-	ଗ୍ରାମେ ଥାକା ।
ପରୋଯା	-	ଭୟ ନା କରା ବା ଭୟ ନା ପାଓଯା ।
ଏକର	-	୧୦୦ ଶତାଙ୍କ ପରିମାଣ ଜମି ।
ଓଭାରଶିଯାର	-	ବିଷସମ୍ପଦି ଦେଖାଶୋନା କରେ ଯେ ।
ଛଳଚୁତା	-	ନାନା କୌଶଳ ।
ଜମିଜିରାତ	-	ଜାଯଗାଜମି ।
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	-	କୋନୋ ବିଷୟେ ଐକମତ୍ୟ ।
ରୂପଳ	-	ରାଶିଯାର ମୁଦ୍ରାର ନାମ ।
ଜୋଗାଡ଼	-	ଆଯୋଜନ, ବ୍ୟବସ୍ୟା, ସଂଘର୍ଷ, ଆହରଣ ।
ଅଭିଭୂତ	-	ଆଚନ୍ନ, ବିହର ।
ଅତିଥି	-	ମେହମାନ, ଆଗଭ୍ରକ ।
ଭଲଗା	-	ରାଶିଯାର ଏକଟି ବିଖ୍ୟାତ ନଦୀର ନାମ ।

স্টিমার	-	একধরনের জলযান।
গন্তব্য	-	উদ্দেশ্য, লক্ষ্যস্থল।
উর্বর	-	অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম।
অবিশ্বাস্য	-	বিশ্বাসের অযোগ্য, বিশ্বাস করা যায় না এমন।
পন্থনি	-	নির্ধারিত করা দেওয়ার নিয়মে যে ভূসম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে।
পঞ্চায়েত	-	গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিচারসভা; গ্রামের পাঁচজনের বৈঠক।
গো-চারণ ভূমি	-	গবাদি পশু চরে বেড়ায় যেখানে।
বাসক্রিডের দেশ	-	রাশিয়ার কোনো একটি জাতির আবাসভূমি।
বাগিয়ে নেওয়া	-	কৌশলে আয়ত্ত করা, কৌশলে লাভ বা আদায় করা।
অনায়াসে	-	অল্প পরিশ্রমে, সহজে।
জমিদার বনে যাওয়া	-	জমিদার হওয়া, অনেক ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া।
মঙ্গুর	-	শ্রমিক।
কুসিম	-	একধরনের পাণীয়।
অভ্যর্থনা	-	সাদরে গ্রহণ, সৎবর্ধনা, আপ্যায়ন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জমি যদি পাই তা হলে কাউকে পরোয়া করব না'- পাখোমের এ বক্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
 - ক. অর্থলিঙ্গা
 - খ. অহংকার
 - গ. আকাঙ্ক্ষা
 - ঘ. দূরদর্শিতা
২. নিচের কোন বাক্যে পাখোম চরিত্রের বিপরীত সত্তা প্রকাশ পেয়েছে?
 - ক. তারপরও কিছু উর্বর জমি ছেড়ে আসতে পারে নি
 - খ. তাকেও জমি দখলের দৌড় শুরু করতে হবে
 - গ. সব অর্থ, সব পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে না
 - ঘ. গভীর যত্ন আর মায়া দিয়ে সে ফসল ফলায়
৩. স্টার্শিনা পাখোমকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল কেন?
 - ক. পরিশ্রম করে ফসল ফলায় বলে
 - খ. জমির প্রতি মায়া ময়তার কারণে
 - গ. লোভের পরিগাম হয় ভয়াবহতা বোঝাতে
 - ঘ. শহরের চেয়ে গ্রামের বাড়ি ভালো বোঝাতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সজিব সাহেব অফিস থেকে যে বেতন পান তা দিয়ে তার সংসার ভালোই চলছিল। তারপরেও আকাশ ছেঁয়া স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি অসৎ পথে পা বাঢ়ান। বিবেক বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েন অনেকিক কাজে। একটার পর একটা কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে থাকে তার। একদিন অবৈধ অর্থের লেনদেনের সময় হাতে নাতে ধরা পড়েন তিনি। আদালতের রায়ে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াঙ্গ হয় তার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাণ কয়েনি সজিব সাহেবের অবস্থান এখন কারাগারের একটি ছোট ঘরে।
 - ক. ‘দিন প্রতি’ বলতে কোন সময়কে বোঝায়?
 - খ. ‘বুকের ভিতর কে যেন হাপর টানছে’— কথাটি ব্যাখ্যা কর।
 - গ. উদ্বীপকের সজীব সাহেবের সাথে ‘সাড়ে তিন হাত জমি’ গল্লের পাখোম চরিত্রের যে দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্বীপকের মূলভাবকে ‘সাড়ে তিন হাত জমি’ গল্লের মূলভাবের সমার্থক বলা যায় কি? উন্নরের অপক্ষে যুক্তি দাও।
 ২. এক চাষির একটি রাজহাঁস ছিল। হাঁসটি প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়ত। ফলে অল্প দিনেই চাষির ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এখন সে বড় বড় টিনের ঘর-বাড়ির মালিক হয়ে গেল। চাষির আরও বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা হলো। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য একদিন সে রাজ হাঁসটিকে জবাই করল। কিন্তু হায়! একি! হাঁসের পেটে কোনো ডিম নেই। চাষি মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে কাল্প-কাটি করতে লাগল, আমি এ কী করলাম!
- ক. একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে পাখোম কোথায় যাত্রা করলো?
 - খ. ‘নিজেকে বাঁচানোই এখন একমাত্র চিন্তা’— কেন?
 - গ. উদ্বীপকের সাথে ‘সাড়ে তিন হাত জমি’ রচনার যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. ‘উদ্বীপকের চাষির সিদ্ধান্তের সাথে পাখোমের সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে’— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত



দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য